বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে মহিলা সংগঠনের ভূমিকা

রিতা পারভীন

GIFT

Dhaka University Library
382777

382777

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল.ডিগ্রীর জন্য আংশিক শর্ত পূরনের লক্ষ্যে এই অভিসন্দর্ভ জমা দেয়া হল।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

জুন, ১৯৮৮

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বস্তু সংক্ষেপ

(Abstract)

বাংলাদেশের নারীসমাজ সামাজিক, আইনগত, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নির্যাতিত ও অবহেলিত। এই প্রেক্ষাপটে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বিভিন্ন নারী সংগঠনের জন্ম হয়েছে। "বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ" এরূপ একটি অন্যতম নারী সংগঠন। এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মূলতঃ মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত মহিলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জন্মলগ্ন থেকে নারী উন্নয়নকল্পে মহিলা পরিষদ স্বেচ্ছায় ও সরকারকে সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী হিসেবে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করেছে তথাপি সর্বক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করেনি। কিছু ব্যর্থতা সত্বেও মহিলা পরিষদের মত অন্যান্য সকল মহিলা সংগঠনের সক্রিয় প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের নারী সমাজের অগ্রগতি ও উন্নয়ন সম্ভব।

382777

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ ও কৃতজ্ঞতাস্বীকার

(Preface and Acknowledgement)

সুদীর্ঘকাল ধরে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে নারীসমাজের অগ্রগতির লক্ষ্যে বিভিন্ন নারী সংগঠন বিভিন্ন সময়ে জন্মলাভ করেছে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমেও নারী সমাজের মুক্তির প্রয়াস বিভিন্ন বুদ্ধিজীবি চালিয়েছেন, কিন্তু এখনও নারী সমাজের সামগ্রীক অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বাংলাদেশে নারীমুক্তি আন্দোলনের জন্য বিভিন্ন নারী সংগঠন রয়েছে। এই গবেষণার সীমিত পরিসরে বাংলাদেশের একটি বিশেষ নারীসংগঠন - বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ — সম্পর্কে এই অভিসন্দর্ভটি (Thesis) রচিত হয়েছে।

382777

অভিসন্দর্ভটি রচনা করতে গিয়ে প্রায় তিন বছর সময় অতিবাহিত করেছি। এর মধ্যে এক বছর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে কোর্সওয়ার্ক করেছি। অভিসন্দর্ভটি লেখার ক্ষেত্রে আমি অনেকের কাছেই কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার তত্ত্বধায়ক অধ্যাপক ডঃ নাজমা চৌধুরীর কাছে। তিনি এই অভিসন্দর্ভটি লেখার জন্য বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং লেখার বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্যবান আলোচনা ও উপদেশের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর অবদান আমাকে চিরতরে তাঁর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। এছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ সামসুল হুদা হারুণ গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ করে কিছু কিছু অধ্যায় রচনার ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান অভিমত দিয়ে সাহায্য করেছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে আমার অন্যান্য শিক্ষক অধ্যাপক ডঃ এমাজউদ্দিন আহমদ, ডঃ বোরহানউদ্দিন খান জাহাংগীর এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সৈয়দ মকসুদ আলীর কাছেও আমি ঋণী। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ডঃ আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান পরামর্শ ও আলোচনার মাধ্যমে আমার গবেষণা প্রবন্ধের মান বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছেন। গবেষণার

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ মাহমুদা ইসলামেরও মূল্যবান উপদেশ পেয়েছি। আমি তাঁদের সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বৃত্তি না পেলে আমার পক্ষে এই গবেষণা কাজ চালানো দুরুহ হত।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানালে আমার এই গবেষণা প্রবন্ধ লেখা অসমাপ্ত রয়ে যাবে বলে আমি মনে করি। কারণ মহিলা পরিষদের কয়েকজন নেত্রী বিশেষ করে মালেকা বেগম ও আয়েশা খানমের কাছ থেকে অকৃত্রিম উৎসাহ ও সহযোগিতা পেয়েছি। পরিষদের কার্যক্রম দেখার জন্য আমি বিভিন্ন সময় পরিষদের অফিসে বসে থেকেছি। পরিষদের বিভিন্ন বার্ষিক প্রতিবেদন ও রিপোর্ট দেখেছি। সর্বোতোভাবে আমাকে মহিলা পরিষদ সাহায্য করেছে। আমি সংগঠনটির কাছে কৃতজ্ঞ। আমি আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী-কাম-টাইপিস্ট জনাব মোঃ ইউসুফ খানকে যার পরিশ্রম ছাড়া এই প্রবন্ধ এভাবে পাওয়া সম্ভব হত না। পরিশেষে, আমি অকপটে স্বীকার করতে চাই, এই গবেষণার ভুল-ভ্রান্তিটুকু একান্তভাবে আমারই। বিশেষ যত্ন সত্ত্বেও টাইপের যে ভুল রয়ে গেছে আমি সেজন্য দুঃখিত।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

(Contents)

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
ভূমিকা :	সমস্যা নির্বাচন ও তত্ত্বগত কাঠামো, বর্তমান গবেষণা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার পদ্ধতি, অভিসন্দর্ভের সংগঠন।	১
প্রথম অধ্যায় :	বাংলাদেশে নারী সমাজের অবস্থান ও মর্যাদা	১১
	সামাজিক অবস্থান, আইনগত অবস্থান, শিক্ষাগত অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান, রাজনৈতিক অবস্থান।	
দ্বিতীয় অধ্যায় :	বাংলাদেশে নারী সংগঠনের বিবর্তন	৪৬
	নারী উন্নয়ন ও সম অধিকার: আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা, উপমহাদেশে নারী আন্দোলনের ধারা, নারী সংগঠনের ধারা ও বৈশিষ্ট্য: পূর্ব পাকিস্তান, নারী সংগঠনের বিকাশ ও ব্যাপ্তী: বাংলাদেশ।	
তৃতীয় অধ্যায় :	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ	৫৯
	জন্মপটভূমি, মূলনীতি ও লক্ষ্য, কর্মসূচী ও দাবী, গঠনতন্ত্র ও সাংগঠনিক কাঠামো।	
চতুর্থ অধ্যায় :	মহিলা পরিষদের নেতৃত্বের প্রকৃতি ও স্বরূপ	৮২
	বয়স, শিক্ষা, পেশা, আয়, শ্রেণীপরিচিতি, দলীয় আনুগত্য, নারী উন্নয়ন ও মহিলা পরিষদ।	
পঞ্চম অধ্যায় :	নারী উন্নয়নে মহিলা পরিষদের ভূমিকা	৯৩
	সামাজিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অন্যান্য ক্ষেত্রে।	
ষষ্ঠ অধ্যায় :	উপসংহার: মূল্যায়ন	১২৪
পরিশিষ্ট :	প্রশ্নমালা	১৩০
গ্রন্থপঞ্জী :		১৩২

Dhaka University Institutional Repository

সারণী সূচী

(List of Tables)

সারণী		পৃষ্ঠা
১.১	আদমসুমারী বছরে বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার	২৭
১.২	বাংলাদেশে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাসমাপ্তির সংখ্যা	২৮
১.৩	বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহনের সংখ্যা	৩১
১.৪	কর্মজীবি পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা	৩৩
১.৫	কর্মজীবি মহিলাদের পেশানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ	৩৪
১.৬	মহিলা রাজনীতিবিদদের জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহন	৩৭
১.৭	জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের ভোটপ্রাপ্তি	৩৭
৪.১	বয়সানুযায়ী মহিলা পরিষদের নেত্রীদের পরিচিতি	৮৩
৪.২	শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে নেত্রীদের শ্রেণীভেদ ৮৫	
৪.৩	পেশানুযায়ী নেত্রীদের শ্রেণীভেদ ৮৬	
৪.৪	আয় অনুসারে নেত্রীদের শ্রেণীভেদ ৮৮	
৪.৫	শ্রেণী পরিচিতি সম্পর্কে সদস্যদের নিজ মূল্যায়ন ৮৯	
৪.৬	নেত্রীদের দলীয় আনুগত্য ৯০	

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সমস্যা নির্বাচন ও তত্ত্বগত কাঠামোঃ

বাংলাদেশের মোট জনশক্তির প্রায় অর্ধেক নারী। আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রায় ৫ কোটি নারী সমাজের অংশগ্রহণ ব্যতীত জাতীয় সার্বিক উন্নয়ণ সম্ভব নয়। দেশের নারী সমাজকে বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এবং দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিককালে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। সরকারী পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পরিদপ্তরের মাধ্যমে এরূপ প্রয়াস চালানো হচ্ছে। অপরপক্ষে, বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন নারী-সংগঠন সরকারের উপর বিবিধ চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে ও নিজ সংগঠনের উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূল স্রোতধারায় মহিলাদেরকে সম্পৃক্ত করার অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এই নারী সংগঠনগুলোকে মূলতঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় "চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী" হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এবং "গোষ্ঠী পদ্ধতির" (Group Approach) আলোকেই নারী উন্নয়নে নারী সংগঠনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সামাজিক বিজ্ঞানে একটি বিপ্লবের সূচনা হয়। এই বিপ্লবকে "আচরনবাদী বিপ্লব" বলা হয়।এই বিপ্লবের মূলকারণ হলঃ উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকাংশই ঔপনিবেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক এবং যান্ত্রিক উন্নতির প্রভাবে এই নতুন জাতিগুলো ক্রমশঃ আধুনিকতার ও প্রগতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। এসব পরিবর্তনের

Dhaka University Institutional Repository

কারণে সনাতন সমাজব্যবস্থার স্থলে আধুনিক সমাজের জন্ম হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো ক্রমাগত আধুনিকতার পথে পা বাড়ানোর সংগে সংগে রাজনীতি অধ্যয়নের সনাতন পদ্ধতি অনুপযুক্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এজন্য পাশ্চাত্যের পেশাদারী বিশেষজ্ঞগণ নতুন পদ্ধতি এবং তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছেন। অপাশ্চাত্য দেশীয় রাজনীতি অধ্যয়নের জন্য গ্রুপ পদ্ধতি বা গোষ্ঠী পদ্ধতি এরূপ একটি পদ্ধতি। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোর কোন সংগঠনের প্রকৃতি ও ভূমিকা বিশ্লেষণে গোষ্ঠী পদ্ধতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ গোষ্ঠীর আচরণ ও সফলতার উপরেই নির্ভর করে কোন সংগঠনের সার্থকতা।

গোষ্ঠী মতবাদের মূলবক্তব্য হলঃ "গোষ্ঠীসমূহের দ্বন্দ্ব বিরোধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কোন সমাজে ব্যক্তিগনের প্রাপ্য সুযোগসুবিধা কর্তৃত্বমূলকভাবে বন্টণ করা হয়।" এই মতবাদ অনুযায়ী "সমগ্র সামাজিক জীবনের সকল স্তরকেই সক্রিয় মানবগোষ্ঠীগুলোর কার্যাবলীর আলোকে বর্ণনা করা যেতে পারে।"[১] গোষ্ঠী মতবাদের ভিত্তি হল গোষ্ঠী, এর আভ্যন্তরীন সংগঠন ও কার্যপ্রক্রিয়া। এই মতবাদের অনুসারিগনের মতে সমাজ অসংখ্য গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত। প্রত্যেক গোষ্ঠীই একে অপরের সংগে অব্যাহতভাবে ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকে। এরূপ সকল গোষ্ঠীই সরকারের নিকট তাদের দাবীদাওয়া উত্থাপন করে এবং সরকার তাদের স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন বা ভারসাম্য বিধানের উপায় হিসেবে কাজ করে। সরকার অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে এখানেই পৃথক যে বিভিন্ন স্বার্থকামী গোষ্ঠীর অব্যাহত স্বার্থের লড়াইয়ের সমস্যা মোকাবেলার বিশেষ উপায় উপকরণ সরকারের হাতে আছে।

গোষ্ঠী মতবাদটি কয়েকজন বিশেষ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর চিন্তাধারায় স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। এই মতবাদের জনক আর্থার বেন্টলী বলেন যে রাষ্ট্র হচ্ছে একটি বিরাট ময়দান আর স্বার্থগোষ্ঠীগুলো হচ্ছে খেলোয়াড়। রাষ্ট্রের সকল সিদ্ধান্তের পেছনে রয়েছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর চাপ এবং কোন বিশেষ গোষ্ঠীরই রাষ্ট্রের উপর

Dhaka University Institutional Repository

একক নিয়ন্ত্রন নেই।[২] বেন্টলীকে অনুসরণ করে ডেভিড ট্রুম্যান বলেন যে গোষ্ঠীবদ্ধ ব্যক্তিবর্গ এক বা একাধিক সাধারণ মনোভাবের ভিত্তিতে কাজ করে যায় এবং এরূপ মনোভাবের অনুসারী আচরনধারা প্রতিষ্ঠা করতে, বজায় রাখতে বা সম্প্রসারণ করতে সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রতি দাবী উত্থাপন করে।[৩] গোষ্ঠীতন্ত্রের অন্যতম প্রবক্তা ডি,ও,কি জুনিয়র বলেন যে রাষ্ট্র বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভারসাম্যকারী হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যে দাবীগুলো আসে সেগুলোর প্রেক্ষিতে সরকার সাধারণ দাবিগুলো পূরনের চেষ্টা করে।[৪] একইভাবে পলসবিও বলেন যে দেশের উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী সিদ্ধানুগুলো গোষ্ঠীচাপের প্রক্রিয়ায় গৃহীত হয়।[৫] সাম্প্রতিক-কালের গোষ্ঠীমতবাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হলেন রবার্ট ডাহল্। তিনি বলেন যে প্রত্যেক দেশেই অনেকগুলো গোষ্ঠী থাকে যারা নিজেদের স্বার্থগুলো সংগঠিত করে এবং সরকারের নিকট দাবী আকারে পেশ করে। সরকারের উপর কোন সংগঠনেরই একচেটিয়া প্রভাব নেই বরং প্রত্যেক গোষ্ঠীই সরকারী কার্যকলাপে প্রভাব রাখার চেষ্টা করে।[৬]

গোষ্ঠীমতবাদকে আরও সম্প্রসারিত করেন এ্যালমন্ড। বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে তিনি এই সিদ্ধানে উপনীত হন যে গোষ্ঠী সাধারণত চার প্রকারের হতে পারে। যথা, — (১) প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক স্বার্থকামী গোষ্ঠীসমূহ, (২) অসংঘযুক্ত স্বার্থকামী গোষ্ঠীসমূহ, (৩) আন্দোলন সূচক স্বার্থকামী গোষ্ঠীসমূহ এবং (৪) সংঘবদ্ধ স্বার্থকামী গোষ্ঠীসমূহ। প্রতিষ্ঠানভিত্তিক স্বার্থকামী গোষ্ঠীর কার্যকলাপ বলতে আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ, সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘঠিত কার্যকলাপকেই বুঝানো হয়। অসংঘযুক্ত স্বার্থকামী গোষ্ঠী বলতে উপজাতীয়, বংশগত, বর্ণগত, ধর্মগত, আঞ্চলিক গোষ্ঠীসমূহকেই বুঝায় যারা অনানুষ্ঠানিকভাবে এবং সময়ে সময়ে ব্যক্তি, উপদল, পারিবারিক ও ধর্মীয়-প্রধান প্রভৃতির মাধ্যমে দাবী বা স্বার্থ জ্ঞাপন করে থাকে। আন্দোলনসূচক স্বার্থকামীদের কার্যকলাপ বলতে সমাজ থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদ্ভূত কম-বেশী স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন-সমূহকেই, যেমন বিক্ষোভ, দাংগা-হাংগামা ইত্যাদিকেই বোঝায়। সংঘবদ্ধ স্বার্থকামী

Dhaka University Institutional Repository

গোষ্ঠীগুলোই হচ্ছে স্বার্থজ্ঞাপনের কাজ সম্পাদনের প্রধান কাঠামো। এদেরই দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে নারী সংগঠনসমূহ, শ্রমিক সংঘ সমূহ, শিক্ষকসমিতি প্রভৃতির। এদের বিশেষত্ব হল যে এরা কোন বিশেষ গোষ্ঠী স্বার্থসমূহের সুস্পষ্টভাবে প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের স্বার্থ ও দাবীগুলোকে প্রণয়ন করার জন্য সুশৃংখল কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করে এবং এসকল স্বার্থের কথা রাজনৈতিক দল, আইনসভা, আমলাবর্গ প্রভৃতি রাজনৈতিক/রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নিকট পেশ করে। স্বার্থজ্ঞাপন কাজের ধরণ প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন, সুনির্দিষ্ট বা বিক্ষিপ্ত, সাধারণ বা বিশেষ এবং বাস্তব বা অনুভূতিমূলক হতে পারে।[৭]

সংক্ষেপে, গোষ্ঠী মতবাদীরা বিশ্বাস করেন যে গোষ্ঠীর রূপ বা প্রকৃতি যাই হোক না কেন, মানুষ একক ব্যক্তি হিসেবে নয় বরং গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবেই তাদের স্বার্থসাধনের জন্য সক্রিয় হয় এবং নিজেদের অনুকূলে সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করানোর ব্যাপারে সচেষ্ট হয়। সমাজ, জাতি, আইনসভা, প্রশাসন, দল — এসকল কিছুই ব্যক্তি-গোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত। কোন কোন গোষ্ঠীর সদস্যগণ অন্যান্য গোষ্ঠীরও সদস্য থাকেন। এসকল গোষ্ঠী নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনবরত পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপে রত হয়। গোষ্ঠী মতবাদের প্রবক্তাগণ মনে করেন যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর কার্যকলাপ সমাজে ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা আনয়ন করতে সহায়ক হয়।

তত্ত্বগঠনে গোষ্ঠীতত্ত্বের প্রয়োগযোগ্যতা ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সমালোচক এই তত্ত্বের ত্রুটি বের করেছেন। প্রথমতঃ গোষ্ঠী মতবাদে সকল কার্যকেই গোষ্ঠীর কার্যকলাপ হিসেবে গণ্য করা হয়, সেখানে গোষ্ঠীর ভূমিকার কথাই কেবল বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা গোষ্ঠী মতবাদে বিবেচিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ গোষ্ঠীমতবাদে একথা স্বতসিদ্ধ হিসেবেই ধরে নেয়া হয় যে কোন গোষ্ঠী যত ব্যাপক সদস্য বিশিষ্টই হোক না কেন তা ব্যক্তির সকল

Dhaka University Institutional Repository

আশা আকাংখা ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। এ ধারণা বাস্তবে সব সময় ঠিক না। তৃতীয়তঃ গোষ্ঠী মতবাদ সম্পূর্ণভাবে বা অপরিহার্যভাবে সত্য নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে, গোষ্ঠীর চাপে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বটে। কিন্তু সবক্ষেত্রেই সরকারী সিদ্ধান্ত যে গোষ্ঠীর চাপেরই ফল তা বিশ্বাসযোগ্য নয় বা বাস্তবতার দ্বারা সমর্থিত হয় না। জনকল্যান সাধনের ধারনা, জনগনের সুস্পষ্ট মতামত ও অনুভূতি, জাতীয় বৈশিষ্ট্য, বিচারবুদ্ধি, জ্ঞান ইত্যাদিও সরকারকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। পরিশেষে, গোষ্ঠী মতবাদে লক্ষ্য অর্জনের বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করলেও সমাজজীবনে মানুষের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এতে তা ব্যাখ্যা করা হয় না। কিভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষ্য নির্ধারিত হয় তার ব্যাখ্যাও এই মতবাদে দেখতে পাওয়া যায় না।[৮]

উপরিউক্ত সমালোচনাগুলো সত্ত্বেও এই গবেষণার ক্ষেত্রে গোষ্ঠী তত্ত্বটি প্রয়োগ করা হয়েছে কারণ এরূপ গবেষণার ক্ষেত্রে গোষ্ঠী মতবাদই একমাত্র উপযুক্ত মতবাদ। বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে মহিলা সংগঠনের ভূমিকাকে শ্রেণী পদ্ধতি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যুক্তিযুক্ত হবে না কারণ মহিলা সংগঠনগুলোর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। আবার এলিট পদ্ধতি প্রয়োগ করাও যথোপযুক্ত হবে না কারণ এলিট মহিলারা সংগঠনগুলো সম্ভবতঃ নিয়ন্ত্রণ করলেও এসব সংগঠনের সাধারণ লক্ষ্য নারী সমাজের উন্নয়ন সাধন। এসব কারণে বর্তমান গবেষনায় মহিলাদের একটি গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা হয়েছে। বাংলাদেশের নারী সমাজের অগ্রগতির জন্য নিঃসন্দেহে নারী সংগঠনগুলো চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। দীর্ঘ দিন ধরে এই নারী সংগঠনগুলো দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দাবী সংগ্রহ করে সেগুলোকে সরকারের নিকট কখনও প্রকাশ্যে কখনও সুপ্তভাবে পেশ করেছে। এরাই বাংলাদেশের মহিলাদের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছে, উৎসাহ জানিয়েছে এবং সরকারী প্রচেষ্টায় বা নিজ চেষ্টায় সেগুলো সমাধানের

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করেছে। সরকার অবশ্যই নারী কল্যানের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন আইন সংশোধন করেছে এবং নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তবে এসব বিষয়গুলো সরকারকে অবহিত ও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করেছে মূলতঃ নারী সংগঠনগুলো। বাংলাদেশে অধিকাংশ নারী সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই উল্লেখিত আছে এবং সকলেরই লক্ষ্য হল নারীমুক্তি, কল্যান ও অগ্রগতি। এসব কারনকেই মুখ্য বিবেচনা করে বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে নারী সংগঠনগুলোকে গোষ্ঠী মতবাদের আলোকে সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী হিসেবেই নারীসংগঠনের মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণা

বাংলাদেশে বেশ কিছু সংখ্যক নারী সংগঠন রয়েছে। বাংলাদেশের মহিলা পরিদপ্তরের ১৯৮৪-৮৫ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী একমাত্র ঢাকা জেলায় ২২৫টি নিবন্ধীকৃত (registered) নারী সংগঠন রয়েছে।[১] তবে সকল নারী সংগঠনের কার্যকলাপের পরিসর এক নয়। এদের মধ্যে কিছু কিছু সংস্থা রয়েছে যাদের আয়তন একটি নির্দিষ্ট মহল্যা, ইউনিয়ন বা অঞ্চল পর্যন্ত সীমিত। অন্যগুদেশে শাখা প্রশাখা রয়েছে এবং জাতীয় পর্যায়ে নারী উন্নয়নে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বা হচ্ছে সেগুলোর পশ্চাতে যেসকল সংগঠনের চাপ রয়েছে সেগুলোর সংখ্যা খুব বেশী নয়। আবার ঐ সকল নারী সংগঠনের মধ্যে সব সংগঠনের প্রভাব একইরূপ নয়। কিছু কিছু সংগঠন রয়েছে যেগুলোর সদস্যা সংখ্যা ব্যাপক, শাখা প্রশাখা দেশব্যাপী ব্যাপ্ত এবং নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিবিধ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই গবেষণার সীমিত পরিসরে বাংলাদেশের সকল নারীসংগঠনের ভূমিকা বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। একারনে আমি বাংলাদেশের একটি বিশেষ নারী সংগঠনকে নির্বাচন করেছি। এই সংগঠনটি হচ্ছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। বাংলাদেশের বিভিন্ন নারী

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠনের মধ্য থেকে এই বিশেষ সংগঠনটি গবেষনার জন্য নির্বাচনের মূল কারণ হল তিনটি।

প্রথমতঃ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদই একমাত্র সংগঠন যেটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জন্ম নিয়েছিল। সেই হিসেবে বাংলাদেশের এটি একটি আদি নারী সংগঠন/ এবং এখনও সক্রিয়ভাবে টিকে রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মহিলা পরিষদের সদস্যসংখ্যা, শাখা-প্রশাখা সম্ভবতঃ দেশব্যাপী ব্যাপৃত এবং নারী উন্নয়নে বিবিধ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এই সংগঠনটিকে অনায়াসেই তুলনামূলক ভাবে সুবিস্তৃত, সুসংগঠিত ও সক্রিয় বলে চিহ্নিত করা যায়।

তৃতীয়তঃ সর্বোপরি, এ পর্যন্ত বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ভূমিকা সম্পর্কে কোন গবেষণামূলক কাজ হয়েছে বলে জানা যায় নি। প্রধানতঃ এই তিনটি কারণে "বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ"কে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে মহিলা সংগঠনগুলোর উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কিভাবে সহায়তা করছে এবং করতে পারে সে ব্যাপারে এই গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজন। সংক্ষেপে, এই গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য হল চারটি :-

১. প্রথমতঃ বাংলাদেশের নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক, আইনগত, শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক অবস্থান বিশ্লেষণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

২. দ্বিতীয়তঃ সামগ্রিকভাবে নারী সংগঠনের বিবর্তন ও ঐ প্রেক্ষাপটে মহিলা পরিষদের আবির্ভাব বিশ্লেষণ করা।

৩. তৃতীয়তঃ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নেতৃত্বের প্রকৃতি বিচার করা, এবং

৪. চতুর্থতঃ বাস্তবে নারী উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ভূমিকা মূল্যায়ন করা।

গবেষণার পদ্ধতিঃ

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উপর গবেষণা চালাতে গিয়ে প্রধানতঃ সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষনমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতেই সংগঠনের আচরণ সবচেয়ে সুষ্ঠুভাবে অবলোকন করা সম্ভব।[১০] এই উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্নমালা (Questionare) তৈরী করা হয়েছিল। ঐ প্রশ্নমালার ভিত্তিতেই বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্যাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। প্রশ্নগুলো উন্মুক্ত ছিল (পরিশিষ্ট দেখুন)। প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পরিষদের নেত্রীবৃন্দের ব্যক্তিগত পরিচয় পাওয়া গেছে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের কার্যধারা অবলোকন করা হয়েছে। এছাড়া, নারী সংগঠন ও নারী সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, রিপোর্ট, মহিলা পরিষদের বিভিন্ন সেমিনার রিপোর্ট ও কার্যবিবরণী, সরকারী রিপোর্ট ও পরিসংখ্যানাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। সমস্ত সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মহিলা পরিষদের কার্যকলাপের একটি মূল্যায়ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বলা বাহুল্য, যে এই গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। প্রধানতঃ এই গবেষণা বাংলাদেশের নারী সংগঠনের মধ্যে মাত্র একটি নারী সংগঠনের বিশ্লেষনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং এই গবেষণার ভিত্তিতে বাংলাদেশের সকল নারী সংগঠনকে একইভাবে বিশ্লেষণ করা যুক্তিযুক্ত হবে না। তবে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বিশ্লেষণ থেকে বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে নারী সংগঠনের ভূমিকার একটি সাধারণ চিত্র পাওয়া যাবে।

অভিসন্দর্ভের সংগঠনঃ

এই গবেষণা প্রকল্পটি আলোচনার সুবিধার্থে ভূমিকা বাদ দিয়ে সমগ্র বিষয়টিকে ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশে নারী সমাজের অবস্থান ও মর্যাদার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপমহাদেশে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে নারী সংগঠনের বিবর্তনের একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জন্মপটভূমি, মূলনীতি, কর্মসূচী ও দাবিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে মহিলা পরিষদের নেতৃত্বের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে মহিলা পরিষদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরিশেষে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে, উপসংহারে মহিলা পরিষদের সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং একটি সাধারণ মন্তব্য পেশ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১. G.D. Garson, Group Theories of Politics (London: Sage Publications, 1978), P.91.

২. Arthur F. Bentley, The Process of Government: A Study of Social Pressures (Chicago: Chicago University Press, 1908), P. 207.

৩. David B. Truman, The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion (New York: Alfred A. Knopf, 1951), P. 165.

৪. V.O. Key, Jr. Politics, Parties and Pressure Groups. (New York: Crowell, 1964), Pp. 4-11.

৫. Nelson Polsby, Community Power and Political Theory (New York: Yale University Press, 1963). P. 116.

৬. Robert A. Dahl, A' Preface to Democratic Theory (Chicago: Chicago University Press, 1956), P. 132.

৭. Gabriel A. Almond, "A Functional Approach To Comparative Politics," in the Politics of Developing Areas, eds. Gabriel A. Almond and James S. Coleman (Princeton, N.J: Princeton University Press, 1960), Pp. 26-58.

৮. গ্রুপ তত্ত্বের সমালোচনার জন্য দেখুন, C. Wright Mills, Power, Politics, and People: The Collected Papers of C. Wright Mills, edited by Irving L. Horowitz (New York: Ballantine Books, 1961), P.253, Joseph La Palombara, "The Utility and Limitations of Interest Group Theory in Non-American Field Situations," Journal of Politics, XXII (1960), P.48; Herbert Marcuse, One Dimensional Man (Boston: Beacon Press, 1964), P.12; William E. Connolly, The Bias of Pluralism (New York: Aldine, 1972), P.12; and Clifford Geertz, "The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States" in Old Societies and New States, ed. Clifford Geertz (New York: Free Press of Glencoe, 1965), P. 108.

৯. মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর, বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৮৪-৮৫ (ঢাকা: ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ১৯৮৫), পৃঃপৃঃ ৬৬-৭৬।

১০. C. Selltiz, et. al, Research Methods in Social Relations (New York: Holt, Rineheart and Winston, 1959), P. 201.

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশে নারী সমাজের অবস্থান ও মর্যাদা

সভ্যতার আদিকাল থেকে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি দেশে মহিলা জনগোষ্ঠি পুরুষের কর্তৃত্বাধীন এবং সমাজের ব্যাপক অবহেলিত অংশ। সভ্যতার অগ্রগতিতে নারী সমাজের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে, কিন্তু তা যথেষ্টভাবে স্বীকৃত নয়। জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সর্বস্তরে তারা গৌণ (Secondary) মর্যাদা ভোগ করে থাকে। সমগ্র বিশ্বে নারী সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার এবং নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। ১৯৭৫ সালকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ (International Women's Years) এবং ১৯৭৬-৮৫ দশককে 'নারী উন্নয়ন দশক' (UN Decades of Development For Women) হিসেবে ঘোষনা করে। ১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে ৩০টি ধারা সম্বলিত "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন" সংক্রান্ত একটি কনভেনসনও অনুমোদিত হয়।[১]

বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও মহিলাদের প্রতি বৈষম্য বিরাজমান। বাংলাদেশের সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী (১৯৮১) মোট ৮,৭০৫২ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ৪,৪৮৫০ মিলিয়ন পুরুষ এবং ৪,২২০২ মিলিয়ন মহিলা। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ হচ্ছে নারী। কিন্তু মর্যাদার দিক থেকে মেয়েদের স্থান পুরুষের তুলনায় অবনমিত। এদেশে যুগ যুগ ধরে মহিলারা পুরুষের

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃত্বের অধীন, পরিবারের লালনকর্ত্রী এবং শিশুর জন্মদাতা হিসেবেই পরিগণিত হয়ে এসেছে। এই অধ্যায়ে মূলতঃ বাংলাদেশের নারী সমাজের প্রকৃত অবস্থান বা মর্যাদা বিশ্লেষণ করা হবে।

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান বা মর্যাদা বিশ্লেষণ করার পূর্বে "নারী মর্যাদা"র সংজ্ঞা দেয়া প্রয়োজন। সামাজিক বিজ্ঞানে "নারী মর্যাদা" বা Women's Status এর সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। একজন বিশেষজ্ঞ বলেন যে, "নারী মর্যাদা বলতে একটি পরিবারে একজন মহিলার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং তার প্রতি পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কর্তৃক প্রদর্শিত সম্মানকে বোঝায়।"[২] কেউ কেউ কেবলমাত্র মহিলাদের অধিকার ও কর্তব্যের সংমিশ্রনকেই নারী মর্যাদা বলেছেন। জাতিসংঘ "নারী মর্যাদার" এক বিশেষ সংজ্ঞা প্রদান করেছে। এই সংজ্ঞানুযায়ী একজন কন্যা, ছাত্রী, স্ত্রী ও মা হিসেবে একটি মহিলার তার পরিবারে অবস্থান ও বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁর অধিকার ও কর্তব্যের সংমিশ্রনই হল নারী মর্যাদা।[৩] আরও পরিস্কারভাবে বলা যায় যে এই সংজ্ঞানুযায়ী একটি পরিবারে পুরুষের তুলনায় মহিলার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যেমন জ্ঞান অনুসন্ধানের সুযোগ, অর্থনৈতিক উপাদানের উপর নিয়ন্ত্রন, রাজনৈতিক অধিকার ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতার প্রকৃতিই নারী মর্যাদা স্থির করে। নারী মর্যাদার এই সংজ্ঞাটিই অধিকহারে স্বীকৃত। এই গবেষণায় এই সংজ্ঞাটিকে গ্রহন করে বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন পরিসীমায় মহিলাদের অবস্থান বা মর্যাদাকে পাঁচভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে— যথা সামাজিক, আইনগত, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মর্যাদা।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক অবস্থান (Social Status):

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা প্রধানতঃ পিতৃতান্ত্রিক। বংশপরিচয় পুরুষ ভিত্তিক এবং পরিবারের কর্তৃত্ব ও মালিকানা পুরুষকেন্দ্রিক। এই সামাজিক ব্যবস্থা বাংলাদেশের মেয়েদেরকে পুরুষের অধীনস্থ ও নির্ভরশীল করার জন্য অনেকাংশে দায়ী। বাংলাদেশের সনাতন সমাজ প্রথায় মেয়েদের প্রতি বৈষম্য জন্মলগ্ন থেকেই প্রদর্শিত হয়। কোন পরিবারে ছেলে শিশুর জন্ম হলে ঐ জন্মমুহূর্তটি উৎফুল্লের সাথে উৎযাপিত হয়। তার জন্য "আযান" (নামাজের ডাক) দেয়া হয়। ধর্মীয় অনুশাসনুযায়ী তার নামকরনে দুটি ছাগ পশুর জীবন উৎসর্গিত হয়। কিনু একটি মেয়ে শিশুর জন্ম হলে পিতা মাতা বা আত্মীয়স্বজন খুব কম ক্ষেত্রে ঐ জন্মমুহূর্তটিকে উৎযাপন করে। এমন কি এক্ষেত্রে আযান পর্যনু দেয়া হয় না। আর ধর্মীয় অনুশাসনে তার নামকরনে একটি ছাগ পশু উৎসর্গিত হয়।[৪]

ধর্মীয় আচার, সামাজিক মূলবোধ ও রীতির ফলে একটি কন্যার জন্মলগ্ন থেকেই তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়। কন্যাসনুানের আবির্ভাব পরিপূর্ণভাবে বাঞ্ছনীয়রূপে গৃহীত হয় না। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় একটি মেয়ে প্রধানতঃ অনাকাঙ্খিত ও অর্থনৈতিক বোঝা হিসেবে আবির্ভূত হয়। সমাজ মেয়েদের আচরন ও চরিত্রের উপর অপেক্ষাকৃত কঠিন বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং কঠোরভাবে সেগুলো প্রয়োগ করে থাকে। এছাড়া, অর্থনৈতিক দিক থেকেও সে পরিবারের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তা বিধান করতে অপরাগ। তার লালন ও প্রতিপালন এবং বিয়ের দায়-দায়িত্ব ও খরচ পিতামাতাকে বহন করতে হয়। এমনকি স্বামীগৃহে তার নিরাপত্তা ও যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও পিতামাতাকে সর্বদাই সজাগ থাকতে হয়। সুতরাং সমাজে সার্বিকভাবে মেয়েদের এই নাজুক ও দুর্বল অবস্থানের মোকাবেলায় সামাজিকীকরন প্রক্রিয়া তাদের চরিত্রে দুটি বিশেষ গুনের সমাবেশ ঘটায় — ধৈর্য্য ও ত্যাগ।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি মেয়ে স্বাধীন বা স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে খুব কম ক্ষেত্রেই বেঁচে থাকতে পারে। জীবনের প্রথম চার/পাঁচ বছর অতিবাহিত হলেই একটি মেয়ে তার পিতৃপরিবারে বিভিন্নভাবে গৃহপরিচালনার কাজে সাহায্য করে থাকে, যেমন রান্নার কাজে সহায়তা, ছোট ভাইবোনদের পরিচর্যা করা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কাজ সে করে থাকে। ১৬ বছর বয়সে পদার্পন করতে না করতেই মেয়েদেরকে বিয়ের যোগ্যা মনে করা হয়। গ্রামাঞ্চলে সাধারণতঃ ১২ থেকে ১৬ বছরের মধ্যেই মেয়েদের বিয়ে দেয়া হয়। শহরেও কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়।[৬] বিয়ের আগে পর্যন্ত একটি মেয়ে পিতার এবং পিতার অবর্তমানে বড়ভাই বা চাচার আশ্রয়ে এবং কর্তৃত্বের অধীনে জীবন নির্বাহ করে। বিয়ের পরে সে স্বামী-গৃহে পদার্পন করে। নতুন ধরনের জীবনযাত্রা শুরু হয়। কিন্তু তাতে তার সামাজিক মর্যাদার কোন পরিবর্তন ঘটেনা। বিয়ের পর তার সকল প্রকার নিরাপত্তা ও ভরনপোষনের দায়িত্ব স্বামীর উপর বর্তায়। সুতরাং স্বামীগৃহে সে সম্পূর্ণভাবে স্বামীর কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিছুদিন পর সে সন্তানের জননী হয়। উল্লেখ্য যে সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনে ক্রমে নিজ সন্তানেরা বড় হলে, শাশুড়ীর বার্ধক্যে বা মৃত্যুতে, এবং স্বামীর পরিবারের অপরাপর সদস্যদের বিয়ে হয়ে অন্য সংসারে গেলে বা নিজ সংসার স্থাপন করলে স্ত্রীর নিজ সংসারে অবস্থান তুলনামূলকভাবে উন্নীত হয় এবং স্বামীর সাথে কর্তৃত্ব ও সম্পর্কের কিছুটা উন্নততর সমীকরন ঘটতে পারে। তবে বার্ধক্যে পৌঁছলে মেয়েরা সন্তানের উপর নির্ভরশীল হয়। বৃদ্ধ বয়সে স্বামী উপার্জনোক্ষম হলে বা স্বামীর মৃত্যু ঘটলে, সন্তান বিশেষ করে পুরুষ সন্তানের উপর নির্ভরশীলতার মাত্রা অধিক হয়। এভাবে লক্ষ্য করা যায় বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের কোন স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্তা বা পরিচিতি নেই। সাধারণভাবে বিয়ের আগে থাকে মেয়েদের পিতৃপরিচয়, বিয়ের পর স্বামীর পরিচয় আর বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের পরিচয়। সমস্ত জীবনব্যাপী একটি মেয়ের পরিচয় হলো কখনো "কন্যা", কখনো "বধূ", আবার কখনো "জননী।"[৭] অর্থাৎ জীবন

Dhaka University Institutional Repository

চক্রের (Life Cycle) বিভিন্ন পর্যায়ে পুরুষের সংগে সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজে নারী আরোপিত মর্যাদা (Derived Status) লাভ করে।

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা নিঃসন্দেহে অবনমিত এবং পুরুষের উপর নির্ভরশীল। নারী সমাজের এরূপ অবস্থানের অন্যতম কারন হলো পর্দাব্যবস্থা।[৮] এই ব্যবস্থাই মেয়েদেরকে নিয়ন্ত্রনে এবং নির্ভরশীল রাখার জন্য পুরুষের প্রধান হাতিয়ার। বাংলাদেশের গ্রামে ও শহরে মেয়েদেরকে কোন না কোন ভাবে পর্দা মেনে চলতে হয়। গ্রামে সাধারণতঃ প্রতিপত্তিশীল বা খ্যাতিসম্পন্ন পরিবারেই পর্দার প্রচলন বেশী। তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতাই পর্দা মেনে চলতে সহায়তা করে। পর্দাব্যবস্থা বিভিন্নভাবে মেয়েদের গতিবিধি ও চলাফেরা নিয়ন্ত্রন করে। বিশিষ্ট গবেষক হ্যানা পাপানেকের মতে এই ব্যবস্থা মেয়েদের গতিবিধি দু'ভাবে নিয়ন্ত্রন করে। প্রথমতঃ পর্দার কারনেই মহিলাদের গৃহসীমানার মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে হয়। গৃহসীমানার মধ্যেই তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকে, যেমন গোসলের জন্য পৃথক পুকুর বা কুয়ো থাকে। দ্বিতীয়তঃ পর্দার কারনেই গৃহের অভ্যন্তরে মেয়েদেরকে বিভিন্ন কাজ করতে হয় যথা — (১) সাংসারিক কাজ - রান্না বান্না, বাসন ধোয়া প্রভৃতি, (২) সন্তান প্রতিপালন সংক্রান্ত কাজ, (৩) কৃষির সংগে জড়িত কাজ — বীজ সংরক্ষন, শষ্য গুদামজাতকরন, চাউল উৎপাদন প্রক্রিয়াকরন প্রভৃতি, (৪) অন্যান্য কাজ — খামার সংরক্ষন, ফলমূল ও শাক-সব্জীর বাগানের যত্ন নেয়া ও হাঁস মুরগী প্রতিপালন প্রভৃতি। গৃহসীমানার বাইরের কাজ যেমন বাজারে যাওয়া বা মাঠের কাজ পুরুষেরাই করে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের গ্রামের মেয়েরা যদি কখনো প্রয়োজনে গৃহসীমানার বাইরে যায় তবে পর্দা রক্ষার্থে তাদের "বোরখা" পরিধান করতে হয়।[৯] কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রমনের সময় চারিদিক দিয়ে যানবাহনকে আচ্ছাদন করে রাখা হয়। দরিদ্র পরিবারে

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েদেরকে বেঁচে থাকার জন্য ধনী পরিবারের গৃহস্থলীর কাজ করতে যেতে হয়। ঐ সময় এরূপ মেয়েরা বোরখার অভাবে শাড়ীর সাহায্যেই তাদের শরীর ও মুখমন্ডল যথেষ্ট ভাবে আবৃত করে পর্দা পালন করে। সুতরাং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রত্যেক পরিবারেই গ্রামাঞ্চলে পর্দাব্যবস্থা মেয়েদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রন করে।[১০]

পর্দা ব্যবস্থা গ্রামে মেয়েদের কেবলমাত্র গতিবিধি ও চলাফেরাই নিয়ন্ত্রণ করে না বরং তাদেরকে পরনির্ভরশীলও করে তোলে। পর্দার কারনেই মেয়েদের শিক্ষার হার অনেক কম (১৩·২%) বলা চলে। পর্দার জন্যই মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে স্বাবলম্বী হতে পারে না। প্রাইমারী স্কুলে পড়াশুনা শেষ হতে না হতেই একটি মেয়ের বয়স ১২-১৩ বছর হয় এবং সাধারণতঃ ঐ সময়েই বাংলাদেশের একটি মেয়ে যৌবনে পা দেয়। ফলে তখন থেকেই পর্দা মেনে চলতে হয়। অনেক গ্রামেই মাধ্যমিক স্কুল বা মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল নেই। তাই এ বয়সে বা প্রাইমারী স্কুলেই তাদের শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে।[১১] বিয়ের পর স্বামীগৃহে প্রবেশ করার পরও তাকে পর্দা মেনে চলতে হয়। সুতরাং বাংলাদেশের গ্রামে পর্দা প্রথার কারনেই মেয়েদের স্বল্প শিক্ষার হার পরোক্ষভাবে তাদের সামাজিক পদমর্যাদাকে নিম্নতর ও পুরুষের উপর নির্ভরশীল করেছে।[১২]

বাংলাদেশে গ্রামের তুলনায় শহরে পর্দার প্রভাব কিছুটা কম, তবে বিরল নয়। শহরে সামাজিকভাবে সাধারণতঃ দু'ধরনের মহিলা দেখা যায়ঃ শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত মহিলা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত মহিলা। শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত পরিবারে পর্দাব্যবস্থা কঠোরভাবে পালিত হয় না।[১৩] কারন তাদের অধিকাংশেরই বাসগৃহ নেই এবং তারা সামাজিক স্বীকৃতিতে বিভিন্ন প্রকারের নিম্নমানের পেশায় নিয়োজিত থাকে। তারা ভাসমান জনগোষ্ঠির অংশ এবং বস্তি এলাকার বাসিন্দা। সুতরাং এদের ক্ষেত্রে পর্দার কঠোর বা সার্বজনীন প্রয়োগ নিস্ফল। গ্রামের সংগে তাদের নিয়মিত যোগসূত্র আছে।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে সামাজিক অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন এসব পরিবারে লক্ষ্য করা যায় না। তাদের মধ্যে শিক্ষার হার অতি নিম্ন এবং অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে হয়। অপরপক্ষে মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন ধারন পদ্ধতি একটু ভিন্ন ধরনের। এসব পরিবারে পর্দা বিভিন্নভাবে রক্ষিত হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা স্কুলে, কলেজে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। তাদের মধ্যে অনেকে অফিসেও চাকুরী করে। কেউ কেউ শিক্ষিকা এবং ডাক্তার হয়, তবুও পর্দা বিরল নয় কারণ মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল এবং কলেজ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে মেয়েরা একসাথে ক্লাস করে তবুও লাইব্রেরীতে মেয়েদের জন্য আলাদা পাঠকক্ষ এবং আলাদা বিশ্রামাগার প্রভৃতি আছে। বাসে, ট্রেনে মেয়েদের বসার আলাদা আসন থাকে। পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও মেয়েরা এমনসকল পেশায় নিযুক্তি লাভের চেষ্টা করে যেগুলোতে মেয়েদের সংস্পর্শে থাকার সম্ভাবনা থাকে। যেমন, অধিকাংশই ডাক্তার এবং শিক্ষিকা হবার চেষ্টা করে। কারণ এসকল পেশায় মহিলাদের সংগে যোগাযোগের সম্ভাবনা থাকে।[১৪] অতএব বোরখা পরিহিত না হলেও মধ্যবিত্ত পরিবারেও মেয়েদের চলাফেরা, গতিবিধি, আচার আচরণ, পড়াশুনা ও পেশা নির্বাচন সবকিছুই "পর্দামূলবোধ" বা "Purdah Values" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে পর্দাব্যবস্থা বাংলাদেশের সমাজকাঠামোতে মেয়েদেরকে অধস্তন করে রাখার জন্য অনেকাংশেই দায়ী। অবশ্য এই পর্দার কঠোর প্রয়োগ ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। মূলতঃ অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত কারনেই এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গ্রামে ভূমিহীন এবং দরিদ্র পরিবারে মেয়েদেরকে বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন প্রকারের নিম্নমানের পেশায় নিয়োজিত হতে হচ্ছে।[১৫] বিভিন্ন সরকারী কর্মসূচীতে যেমন "কাজের বিনিময়ে খাদ্য" (Food for Works) কর্মসূচীতে কাজ পাওয়ার জন্য গ্রামের অনেক মেয়েই বাড়ীর চত্বর থেকে বেরিয়ে আসছে। তবে

Dhaka University Institutional Repository

এই পরিবর্তনের গতি খুব মন্থর। তাছাড়া, এসকল মহিলাদের অধিকাংশই হয় তালাকপ্রাপ্ত, বা হয় বিধবা বা ছিন্নমূল।[১৬] শহরেও মেয়েদের কর্মসংস্থানের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির সংগে সংগে মেয়েদের সামাজিক মর্যাদার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। তবে তা অত্যন্ত নগন্য ও সীমিত। এখনও বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা অধস্তন এবং পরাজীবির মত পুরুষের উপর নির্ভরশীল।

আইনগত অবস্থান (Legal Status)

বাংলাদেশের মেয়েদের প্রতি যেমন সামাজিক বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় আইনগত দিক থেকেও সেইরূপ বৈষম্য প্রদর্শিত হয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে বাংলাদেশের সংবিধানে আইনের চোখে নারী পুরুষ সকলেই সমান। বাংলাদেশের সংবিধানে মেয়েদের সাধারণ অধিকার সম্পর্কে অনেকগুলো ধারা সংযোজন করা হয়েছে। সংবিধানের ১৯ নং ধারায় বলা হয়েছে যে লিঙ্গ ভিত্তিতে মেয়েদের প্রতি কোনরূপ বৈষম্য প্রদর্শন করা চলবেনা এবং সকল নাগরিক যাতে সমান সুযোগ পায় সেজন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে। সংবিধানের ভাষায় "The state shall endeavour to ensure **equal opportunity to all its citizens.**"[১৭] সংবিধানের ২৭ নং ধারায় আরও বলা হয় যে, আইনের চোখে সকলেই সমান। ২৮ নং ধারায় বর্ণিত আছে যে রাষ্ট্র নারী পুরুষ নির্বিশেষে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। এই ধারার ২ নং উপধারায় বলা হয়েছে যে "রাষ্ট্র ও জন জীবনের সর্বস্তরে মহিলারা পুরুষের ন্যায় সম-অধিকার ভোগ করবে।" এমন কি এই ধারার ৪ নং উপধারায় রাষ্ট্রকে এই মর্মে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে যে ইহা প্রয়োজন সাপেক্ষে মেয়েদের এবং শিশুদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

তবে উল্লেখ্য সংবিধানের নারী অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলো সর্বক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমন সংবিধানের ২৯ নং ধারায় দেশের চাকরীতে নিয়োগ সম্পর্কে বিধি বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে লিঙ্গ ভিত্তিতে এদেশে চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্য প্রদর্শন করা চলবে না। তবে এই ধারার ৩ নং উপধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মের প্রকৃতি ভিত্তিতে কিছু কিছু অফিসে মেয়েদের নিয়োগ নাও করতে পারে।[১৮] আইনগতভাবে মেয়েদের সকল রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত এবং যে কোন রাজনৈতিক পদের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করতে পারে, যেমন, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন নারী রাষ্ট্রপতি, জাতীয় সংসদ, জিলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, বা স্থানীয় পরিদগুলোর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। তবে এখানেও বলা বাহুল্য যে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজকাঠামোতে মেয়েদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ভোট প্রধানতঃ পুরুষরাই নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া খুব কম সংখ্যক রাজনৈতিক দলই একটি পুরুষ প্রার্থীর বিপরীতে মহিলা প্রার্থী দাড় করানোর ঝুকি বহন করে থাকে। রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণ কিছুটা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের সংবিধানে/কার্যকরী হওয়ার পর থেকে ১৫ বছরের জন্য জাতীয় সংসদে ৩০টি পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বাংলাদেশের সংবিধানে মহিলাদেরকে যদিও পুরুষের সমান মর্যাদা দেয়া হয়েছে তথাপি মুসলিম পারিবারিক আইন সমূহে (Personal Laws) তাদের প্রতি বিভিন্ন বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়।[১৯] এই বৈষম্যমূলক বিধানগুলো তিন ধরনের আইনে বিদ্যমান। এগুলো হলঃ বিবাহ সংক্রান্ত আইন, তালাক সংক্রান্ত আইন এবং সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত আইন।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ সংক্রান্ত আইনঃ বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে ১৯৩৯ সালের মুসলিম পরিবার আইন অনুযায়ী (Muslim Family Laws Ordinance) এবং হিন্দু সমাজে হিন্দু আইনানুযায়ী বিবাহ ব্যবস্থা নির্দেশিত হয়। হিন্দু আইনানুযায়ী হিন্দু সমাজে বিয়ে হল একটি পবিত্র দায়িত্ব (Sacrament)। প্রত্যেক পিতার দায়িত্ব তার কন্যার বিবাহ প্রদান করা। বাংলাদেশে আইন অনুসারে ১৬ বছরের নিচে মেয়েদের এবং ১৮ বছরের নিচে ছেলেদের বিবাহ নিষিদ্ধ। ১৯৮৪ সালে অবশ্য এই আইন সংশোধন করে মেয়েদের এবং ছেলেদের বিয়ের নিম্নতম বয়োঃ সীমা যথাক্রমে ১৮ বছর এবং ২১ বছর ধার্য করা হয়েছে।[২০] এতে প্রতীয়মান হয় যে এই সমাজে মেয়েদের এবং ছেলেদের পরিপক্কতাকে (maturity) দুই পর্যায়ে বিবেচনা করা হয়। সাধারণভাবে ইসলামিক বিধানুযায়ী মুসলিম সমাজে বিয়েকে একটি চুক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ বিবাহ সম্পন্ন হয় পাত্র-পাত্রীর সম্মতিদ্বারা। ছেলেরা একাধিক বিয়ে করতে পারে। তবে শর্ত যে সকল স্ত্রীকেই সমমর্যাদা দিতে হবে এবং স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েতে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি থাকতে হবে। বাংলাদেশের ১৯৬১ সালের বিবাহ আইনে অবশ্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রথম বিবাহ বহাল থাকার সময় ইউনিয়ন কাউন্সিলের সালিসি পরিষদের অনুমতি না নিয়ে কেউ যদি দ্বিতীয়বার বিয়ে করে তবে তাকে অবিলম্বে প্রথম স্ত্রীর সমুদয় "দেন মোহর"[২১] পরিশোধ করতে হবে এবং একবছর পর্যন্ত বিনাশ্রমে কারাদন্ড বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকারের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে যদিও মহিলাদের অধিকার সংরক্ষনের বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তথাপি বাস্তবে এই আইনের প্রয়োগ বিরল ও কঠিন।[২২] প্রথমতঃ বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এটা মান্য করা হয় না কারণ সামাজিকভাবে স্বীকৃত মেয়েদের 'বিবাহের বয়স' পার হয়ে গেলে সমাজে বিভিন্ন রকম আলোচনা সমালোচনা শুরু হয়। বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে অধিক

Dhaka University Institutional Repository

বয়সে মেয়েদের বিয়ে সুনজরে দেখা হয় না। ফলে মেয়েদের বাল্যবিবাহ ঠিকই হয়ে থাকে।[২৩] দ্বিতীয় বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ থাকলেও লক্ষ্য করা যায় যে পল্লী অঞ্চলে মেয়েদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে পুরুষেরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিয়ে করে থাকে। বহু ক্ষেত্রে গ্রামে বিয়ে রেজিষ্ট্রিও হয় না। প্রথম স্ত্রীকে বিভিন্নভাবে চাপ দিয়ে রাজী করিয়ে স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে থাকে।[২৪] অর্থনৈতিক দুর্বলতা, আইনের অজ্ঞতা, মেয়ের উপর পরিবারের বিভিন্ন চাপ প্রথম স্ত্রীকে তার স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েতে সম্মতি দিতে বাধ্য করে। তৃতীয়তঃ তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে আইনে মোহরানা দেয়ার কথা বলা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে এই মোহরানার কোন মূল্য নেই। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা দেয়া হয় না। একজন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে মোহরানা আদায়ের জন্য কোর্টে যেতে হয়। কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিভংগী ও পর্দা ব্যবস্থার কারনে সে কোর্টে যেতে পারে না। তাছাড়া, একটি মহিলাকে সেই মোহরানা আদায়ের জন্য কোর্টে অনেক টাকা খরচ করতে হয় এবং সেই আর্থিক সংগতিও তার থাকে না।

সুতরাং আদর্শগত দিক দিয়ে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন যতই উন্নত হোক না কেন বাস্তবে এর কার্যকারিতা প্রায় অসম্ভব।[২৫] ১৯৬১ সালের আইনের মত ১৯৮০ সালের যৌতুক আইনও বাস্তবে কার্যকরী করা প্রায় অসম্ভব। বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক বিয়েতেই কন্যার পিতা মাতাকে কন্যার বিয়ের সময় জামাতাকে যৌতুক হিসেবে বেশ কিছু মালামাল বা টাকা পয়সা দিতে হয়। যৌতুক প্রদানে ব্যর্থ হলে বিয়ের পর অনেক স্বামী বিভিন্নভাবে স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালায়। এটা নিরোধকল্পে সরকার ১৯৮০ সালে যৌতুকগ্রহণ বা প্রদানের বিরুদ্ধে একটি আইন পাশ করেছে। এই আইন অনুসারে কেউ কোন যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে অথবা প্রদানে বা গ্রহনে সহায়তা করলে কমপক্ষে একবছর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এই আইনও কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি কারণ এই আইনের মধ্যে বিভিন্ন ফাঁক রয়েছে। উপহারসরূপ মেয়েকে কিছু দেয়া "যৌতুক"

Dhaka University Institutional Repository

দেয়া হবে না এবং বিয়ের সময় কিছু চাওয়াকেই "যৌতুক বলা হবে" এই দু'টি ধারা যৌতুক বিরোধী আইনের মস্ত ফাঁক। যার ফলে যৌতুক বিরোধী আইনের সাহায্যে প্রথম মামলাকারী জহুরা বেগম সমস্ত নির্যাতন ভোগ করা সত্ত্বেও মামলায় হেরেছিলেন এবং তার স্বামীর কোন শাস্তি হয় নি।[২৬]

তালাক সংক্রান্ত আইনঃ "তালাক' হচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটনার একটি উপায়। মুসলিম আইনে যে কোন সাবালক বা সুস্থমনা স্বামী কোন প্রকার কারণ না দর্শিয়ে যে কোন সময় তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। তালাক তিন প্রকার যথা— স্বামী কর্তৃক, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের সম্মতিক্রমে এবং স্বামী বা স্ত্রীর আবেদন ক্রমে আদালত দ্বারকৃত। একজন পুরুষ মুখে তিনবার "তালাক" শব্দটি উচ্চারণ করেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারে। কিন্তু মুসলিম মেয়েরা একইভাবে পুরুষকে তালাক প্রদান করতে পারে না। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে বলা হয়েছে যে, যে-কোন স্বামী যে-কোন সময়ে তালাক ঘোষনা করা হয়েছে বলে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে একটি নোটিশ এবং তার একটি অনুলিপি তার স্ত্রীকে পাঠানোর পর নব্বই দিন অতিবাহিত হলে তালাক বলবৎ হয়।

অপরপক্ষে, বাংলাদেশে একজন স্ত্রীকে তার স্বামীকে তালাক প্রদান করতে হলে বিভিন্ন নিয়মের মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং অধিকাংশ সময়েই এসব নিয়মের গন্ডী অতিক্রম করার চেয়ে অনেক মহিলার কাছে কষ্টের জীবন অতিবাহিত করাই শ্রেয় বিবেচ্য হয়। অবশ্য স্ত্রী যাতে সহজে স্বামীকে তালাক প্রদানের ব্যাপারে আইনের আশ্রয় নিতে পারে সেজন্য বাংলাদেশে ১৯৮৫ সালে বিবাহ সংক্রান্ত এক অধ্যাদেশ জারী করা হয়েছে এবং তাতে বলা হয়েছে যে একজন স্ত্রী তার স্বামীকে

Dhaka University Institutional Repository

তালাক দিতে চাইলে স্থানীয় কোর্টেই ২৫ টাকা ফি জমা দিয়ে দরখাস্ত করতে পারে।[২৭] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাও কোন পরিবর্তন নয়। কারণ ১৯৩৯ সালের বিবাহ আইন অনুযায়ী (যা এখনও বলবৎ আছে) একজন মহিলা কেবলমাত্র নিম্নলিখিত কোন একটি শর্ত সাপেক্ষেই তার স্বামীকে তালাক প্রদানের চেষ্টা করতে পারে। এগুলো হল : (১) স্বামী চার বছরকাল অজ্ঞাত থাকলে, (২) দুই বছরকাল স্ত্রীর ভরন-পোষনে নির্লিপ্ত থাকলে, (৩) মুসলিম পারিবারিক আইন লংঘন করে স্বামী বিয়ে করলে, (৪) স্বামীর সাত বছরকাল বা ততোধিক সময়ের জন্য কারাদন্ড হয়ে থাকলে (৫) স্বামী তিনবছরকাল যাবৎ বৈবাহিক সম্পর্ক পালনে ব্যার্থ হলে, (৬) স্বামী নপুংসক হলে, (৭) স্বামী দুই বছরকাল উনমাদ বা কুষ্ঠরোগাগ্রস্থ হলে, (৮) অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় বিয়ে হলে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে স্ত্রী বিবাহ প্রত্যাখ্যান করতে পারে, (৯) স্বামী নিষ্ঠুর হলে যেমন ধর্মে কর্মে বাধা দিলে, নৈতিকতা-বিরোধী কাজে প্ররোচনা দিলে এবং স্ত্রীকে ক্রমাগত প্রহার করলে ইত্যাদি এবং (১০) মুসলিম আইনে বৈধ বলে স্বীকৃত এরূপ যে কোন কারনে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের দাবী করে মামলা করতে পারে।[২৮]

উপরিউক্ত কারণে আইনগতভাবে একজন স্ত্রী তার স্বামীকে তালাক দিতে পারলেও বাস্তবে এটা খুবই বিরল কারণ সামাজিকভাবে তালাক প্রাপ্ত মহিলাদেরকে অবহেলার চোখে দেখা হয়। আইনের অজ্ঞতা অথবা আইনের আশ্রয় চাইবার আর্থিক সংগতি এবং মানসিকতার অভাব মেয়েদের বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত নির্যাতন সহ্য করতে বাধ্য করে। সামাজিক মূল্যবোধে তালাকের প্রচেষ্টা একজন মহিলার জন্য লজ্জাজনক, তার পিতৃপরিবার ও নিজের মর্যাদাহানিরই নামান্তর। তাছাড়া, তার বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে তার ছোট ভাইবোনদের বা তার কন্যার বিবাহ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, এরূপ পরিবারের সাথে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবার বৈবাহিক

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী থাকেনা এবং বাঞ্ছিত পাত্র পাওয়া দুস্কর হয়ে দাড়ায়। আরও উল্লেখ্য যে তালাকপ্রাপ্ত মা তার শিশুর অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। মাতৃস্নেহ ও শিশুর কথা চিন্তা করে কোন মাতাই সহজে বিবাহ বিচ্ছেদের পথ বেছে নেয় না। বরং ব্যক্তিগত জীবনে নির্যাতন বা অবমাননা সহ্য করেও তালাকের পথ পরিহার করে।

সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন ঃ বাংলাদেশের মুসলিম আইনানুযায়ী মুসলিম সমাজে এবং হিন্দু আইনানুযায়ী হিন্দু সমাজে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধি নির্দেশিত হয়। হিন্দু মহিলারা কোনভাবেই উত্তরাধিকার সূত্রে পিতৃসম্পত্তি বা স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী হয় না। মুসলিম আইনে উত্তরাধিকার হিসেবে মুসলিম মহিলাদের সম্পত্তির অংশ হল নিম্নরূপঃ (১) স্ত্রী; সন্তান থাকলে $\frac{১}{৮}$ অংশ, সন্তান না থাকলে $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে। (২) মাতাঃ সন্তান থাকলে $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং সন্তান না থাকলে $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। (৩) কন্যা পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ।[২৯] ইসলামিক আইনে আরও বলা হয়েছে যে স্ত্রী বেঁচে থাকাকালীন সময়ে যদি স্বামী মারা যায় এবং সেই স্ত্রীর কোন পুত্র সন্তান না থাকে তাহলে স্বামীর সম্পত্তি থেকে সে বঞ্চিত হবে। এসব ক্ষেত্রে পুরুষ উত্তরাধিকারের অভাবে মেয়ের চাচারাই তার বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়।[৩০] যে সম্পত্তি সৃষ্টিতে চাচার কিছু মাত্র অবদান নেই তিনি সেই সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারী হয়ে বিধবা মা এবং কন্যাদের দুর্বিসহ অবস্থায় ঠেলে দিতে পারেন। ঠিক একইভাবে যে কোন মহিলার মুসলিম স্বামী যদি স্বামীর পিতা বেঁচে থাকাকালীন সময়ে মৃত্যু বরণ করে তবে ঐ পিতা তার ছেলের নামে সকল সম্পত্তির অধিকার লাভ করে। এক্ষেত্রে একজন পিতা ইচ্ছা করলে তার মৃতছেলের বিধবা স্ত্রী ও নাবালক ছেলে-মেয়েদেরকে ঐ সকল সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত করতে পারেন। সাধারণতঃ কোন ছেলে-সন্তান না থাকলে বিধবা মায়েরা এ সকল সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। এই

Dhaka University Institutional Repository

প্রবণতাই মেয়েদেরকে পুত্র সন্তান জন্মাতে উৎসাহিত করে।[৩১] সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন যেহেতু মেয়েদের স্বপক্ষে নয় সেহেতু বাংলাদেশের মেয়েরা সর্বদাই নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন অতিবাহিত করে। আর এই আর্থিক অনিশ্চয়তাবোধ শিশু জন্মদানের জন্য অনেকাংশে দায়ী। এও বলা চলে যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনে ছেলে ও মেয়ে উত্তরাধিকারীর মধ্যে এই অসংগতিপূর্ণ পার্থক্য মেয়েদের অবনমিত সামাজিক মর্যাদার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

এখানে বলা বাহুল্য যে বাংলাদেশের সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনে নিঃসন্দেহে মেয়েদের প্রতি বৈষম্য বিরাজমান। আবার, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মেয়েরা স্বামীগৃহে চিরনিরাপত্তাবোধের অভাবে বাবার সম্পত্তির প্রাপ্য সামান্য অংশ দাবী না করে স্বেচ্ছায় ভাইকে তা প্রদান করে। কারণ, প্রথমতঃ ভাইগণ বিপদের সময় নিরাপত্তা প্রদান করে। দ্বিতীয়তঃ বাবার বাড়ীতে মেয়েরা বছরে এক/দুই বার "নায়ের" যায় এবং প্রতিদানে সম্পত্তির অংশে মানসিক দিক থেকে দাবী ত্যাগ করে। তৃতীয়তঃ মেয়েরা বাবা-ভাইয়ের বাড়ীতে বেড়াতে গেলে অধিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে ও গৃহস্থালীর কাজ কর্ম ও দায়-দায়িত্ব থেকে সাময়িকভাবে রেহাই পায়। চতুর্থতঃ পিতৃসম্পত্তির অংশ শেষ পর্যন্ত স্বামীর হাতেই চলে যায় এবং সেজন্য-কন্যারা মনে করে যে পৈত্রিক সম্পত্তি পিতৃপরিবারে থাকাই শ্রেয়। সর্বোপরি, ভাইয়ের কাছ থেকে স্বামীর কাছে সম্পত্তির হস্তান্তর তার জীবনের কোন পরিবর্তন আনে না। এভাবে লক্ষ্য করা যায় যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনও মহিলাদের জীবন উন্নত করার জন্য বাস্তবে খুব সহায়ক নয়।

বাংলাদেশের নারী সমাজের জন্য প্রযোজ্য উপরিউক্ত তিন প্রকার আইন ছাড়াও সম্প্রতিকালে নারী নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে সরকার কয়েকটি আইন পাশ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন, নির্যাতনমূলক শাস্তি অধ্যাদেশ, ১৯৮৩, ধর্ষণ ও এসিড নিক্ষেপ দ্বারা নির্যাতনের জন্য শাস্তি অধ্যাদেশ, ১৯৮৬। এসকল আইনানুযায়ী যদি কোন স্বামী স্ত্রীকে হত্যা করে বা যে কেউ যে কোন বয়সের কোন নারীকে নির্যাতন বা ধর্ষণ করে তবে তার যাবতজীবন বা ১৪ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড হবে।[৩২] কিন্তু বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় বাস্তবে এগুলো প্রয়োগ বা প্রমান করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

শিক্ষাগত অবস্থান : (Educational Status):

শিক্ষার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের নারীসমাজ অনেক পিছিয়ে আছে। মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্মানে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষা ব্যক্তিকে তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে। শিক্ষা নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি, ও জাতির প্রতি তার দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে সাহায্য করে। ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও সৃজনশীল চিন্তাশক্তি বৃদ্ধিতে শিক্ষার প্রভাব অনস্বীকার্য। শিক্ষার সাহায্যে জীবিকা অর্জন ও প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব। এসব কারনেই Universal Declaration of Human Rights এ শিক্ষাকে মানুষের একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানেও ১৭ নং ধারায় বলা হয়েছে যে দেশে এমন এক সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হবে যাতে সমাজের সর্বস্তরের নারীপুরুষ শিক্ষা লাভ করতে পারে।

সংবিধানের নিশ্চয়তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার হার প্রমান করে যে শিক্ষার দিক থেকে মহিলারা ব্যাপক বৈষম্যের শিকার। ১'১ নং সারনী থেকে লক্ষ্য করা যায় যে পুরুষের তুলনায় নারী শিক্ষার হার প্রায় অর্ধেক।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ১.১

আদমসুমারী বছরে বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার

আদমসুমারীর বছর	উভয় লিঙ্গ	পুরুষ	মহিলা
১৯৬১	১৭.০	২৬.০	৮.৬
১৯৭৪	২০.২	২৭.৬	১২.২
১৯৮১	১১.৭	২৫.৮	১৩.২

Source: Government of Bangladesh, Bureau of Statistics, Bangladesh Population Census, 1981, P. 80.

বাংলাদেশের সর্বশেষ আদমসুমারী বছরে (১৯৮১) যেখানে পুরুষের শিক্ষার হার ছিল শতকরা ২৫.৮ সেখানে নারী শিক্ষার হার শতকরা ১৩.২। সামগ্রিকভাবে মেয়ে শিক্ষিতের হারের এই সংখ্যাও শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে বেশী। আবার প্রাথমিক স্তরেও প্রায় গ্রামেই দু-একটি পরিবারের মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ।[৩৫] প্রাইমারী স্কুলে গ্রামের অনেক মেয়েই স্কুলে ভর্তি হয় কিন্তু সমস্যা হল যে তারা প্রাথমিক স্তরের পাঁচ বছরের শিক্ষাকাল অনেকেই সমাপ্ত করে না। অনেক ছেলে মেয়েই দুই এক বছর পর স্কুল ত্যাগ করে। তবে এই হার মেয়েদের মধ্যে বেশী। ১৯৭৮ সালে এক গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশে প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর মাত্র শতকরা ২৪ জন মেয়ে পঞ্চমশ্রেণী পর্যন্ত টিকে থাকে। ছেলেদের মধ্যে এই হার শতকরা ৩১ জন।[৩৬] আরেক গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশের প্রাথমিক স্কুলে সর্বমোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৭.৮ মিলিয়ন এবং এর মধ্যে ২.৭ মিলিয়ন মাত্র ছাত্রী। মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রছাত্রী ৪ মিলিয়ন এবং এর মধ্যে ছাত্রী হল ০.৭ মিলিয়ন। কলেজ গ্রাজুয়েটের সংখ্যা মোট ০.৭ মিলিয়ন এবং এর মধ্যে মহিলা হল ০.০৭ মিলিয়ন।[৩৭] ১৯৮১ সালের

Dhaka University Institutional Repository

আদমসুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের জনগণের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা সমাপ্তির হিসাব (১·২ নং সারনী) থেকেও দেখা যাচ্ছে যে বয়ঃবৃদ্ধির সংগে সংগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের ব্যবধান অত্যন্ত ব্যাপক ও প্রকট।[৩৮] এখানে আরও উল্লেখ্য যে ১৯৮৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩৭০৭৮ এবং এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৫১৫ জন।

সারনী-১·২

বাংলাদেশের শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা সমাপ্তির সংখ্যা, ১৯৮১ (সংখ্যা 00)

লিঙ্গ/আবাস	মোট	১ম শ্রেণী ৫ম শ্রেণী	৫ম শ্রেণী ৯ শ্রেণী	এস, এস, সি এবং এইচ, এস, সি	বি, এ, এবং তার উর্দ্ধে
ক) বাংলাদেশ	২৩৬৭৯	২৫২৭৫	৫৬৪২	২২৮০	৫০৪
১) উভয় লিঙ্গ	(১০০)	(৬৪·৫)	(২৩·৭)	(৯·৬)	(২·১)
২) পুরুষ	১৫৩৯৯	৯০৭৪	৩৯৭১	১৯৯১	৪৪৩
	(১০০)	(৫৮·৯)	(২৫·৮)	(১২·৪)	(২·১)
৩) মহিলা	৮২৭২	৬২০১	১৬৪৯	৩৬৯	৬১·০০
	(১০০)	(৭৫·০)	(১৯·৮)	(৪·৫)	(০·৭)
খ) পুরুষ	১৫৩৯৯	৯০৭৪	৩৯৭১	১৯৯১	৪৪৩
১) বাংলাদেশ	(১০০)	(৫৮·৯)	(২৫·৮)	(১২·৪)	(২·৯)
২) শহর	৩৬৪৫	১৫৯৬	১০৩৩	৭৪০	২৭৬
	(১০০)	(৪৩·৮)	(২৮·৩)	(২০·৩)	(৭·৬)
৩) গ্রাম	১১৭৫৪	৭৪৭৮	২৯৩৮	১১৭৯	১৬৭
	(১০০)	(৬৩·৬)	(২৫·০)	(১০০)	(১·৪)
গ) মহিলা	৮২৭২	৬২০১	১৬৪৯	৩৬৯	৬১
১) বাংলাদেশ	(১০০)	(৭৫·০)	(১৯·৮)	(৪·৫)	(০·৭)
২) শহর	১৯০৮	১০৬৯	৫৬৪	২২০	৫২
	(১০০)	(৫৬·১)	(২৯·৫)	(১·৭)	(২·৭)
৩) গ্রাম	৬৩৬৪	৫১৩২	১০৭৭	১৪৬	৯
	(১০০)	(৮০·৬)	(১৭·০)	(২·৩)	(০·১)

উৎসঃ ১·১ সারনী দেখুন, পৃষ্ঠা-১০ (বন্ধনীর মধ্যে শত করা হিসাব)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের ক্রমহ্রাসমান গতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী হচ্ছে মহিলাদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভংগি ও আর্থিক মূল্যায়ন এবং বিশেষভাবে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতার প্রতি মনোভাব। গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ পিতামাতাই মনে করেন যে মেয়েদেরকে শিক্ষিত করে কোন অর্থনৈতিক লাভ নেই। তারা আশা করেন যে পুত্র সন্তানদের শিক্ষিত করলে তা ভবিষ্যতের আর্থিক নিশ্চয়তা বিধান করবে এবং বৃদ্ধ বয়সে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। কন্যার চেয়ে পুত্র সন্তানদের অর্থনৈতিক মূল্য বেশী।[৩৯] এই ধারনাই পিতামাতাকে কন্যার চেয়ে পুত্রদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে প্রভাবিত করে। পল্লী অঞ্চলে পিতামাতা মনে করে যে শিক্ষিত হওয়ার চেয়ে মেয়েদের গৃহস্থালীর কাজে অভিজ্ঞতা বেশী প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ পিতামাতাই মনে করেন যে মেয়েদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা অর্থাৎ কোরান পাঠই যথেষ্ট। তছাড়া, মেয়েদের শিক্ষিত করে পিতামাতার কন্যাদানের জন্য যোগ্য পাত্র পাওয়া অনেক ক্ষেত্রে খুব কঠিন হয়ে দাড়ায়।[৪০] সর্বোপরি, পরিবারের সীমিত সম্পদের বন্টনে পিতামাতা পুত্রদের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এ সমস্ত কিছুর ফলশ্রুতিতে এদেশে নারীশিক্ষা স্বল্পহারে বাড়ছে।

অর্থনৈতিক অবস্থান (Economic Status):

বাংলাদেশের নারী সমাজের অবনমিত মর্যাদার অন্যতম কারণ হল তাদের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা। অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের নারীসমাজ একান্তই পর-নির্ভরশীল। বিশ্বের অনেক দেশের মতই বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনে মহিলাদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়। অর্থনৈতিকভাবে মেয়েদেরকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালে জাতিসংঘ "নারীর বিরুদ্ধে বিরাজিত সকল

Dhaka University Institutional Repository

প্রকার বৈষম্য অপনোদন" (Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women) নামক এক ঘোষনা প্রদান করে এবং এতে বলা হয় যে বিশ্বের সকল দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার আছে। বাংলাদেশের সংবিধানেও ২০ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি কোনরূপ বৈষম্য প্রদর্শন করা হবেনা।[৪১]

সাংবিধানিকভাবে মেয়েদের অর্থনৈতিক সমমর্যাদার কথা স্বীকৃত হলেও বাস্তবে লক্ষ্য করা যায় যে বাংলাদেশের সরকারী চাকুরীতে মহিলাদের সংখ্যা খুব কম। অন্যান্য কর্মসংস্থানেও মহিলাদের সংখ্যা অতি নগন্য। বাংলাদেশে "কর্মসংস্থান" (Employment) কথাটি সাধারণতঃ মজুরী বা বেতনের বিনিময়ে কাজকেই বোঝায়। অবশ্য নিজ-কর্মসংস্থানকেও (Self-Employment) Employment বলা হয়। নিজ কর্মসংস্থান বলতে সেই সমস্ত কর্মকেই বুঝায় যেগুলোর মাধ্যমে কোন ব্যক্তি নিজ পরিবারের ভোগসামগ্রি সংগ্রহ করে থাকে। যেমন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিখামার, প্রভৃতি। বাংলাদেশে বেতনের বিনিময়ে বা নিজ কর্মসংস্থানেও নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে সম্মিলিতভাবে Civilian Labour Force বলা হয়।[৪২] বাংলাদেশে উল্লেখিত দুই প্রকার কর্মসংস্থান ছাড়া গৃহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত (যেমন, রান্না - বান্না করা, ধান সিদ্ধ করা, ধান শুকানো, চাউল প্রক্রিয়াকরণ করা, শাকশব্জী উৎপাদন করা, হাঁস-মুরগী পালন করা, কাঁথা সেলাই করা, পানি সংগ্রহ করা, কাপড় পরিস্কার করা, শিশু যত্ন প্রভৃতি) ব্যক্তিদেরকে কর্মসংস্থান বা Employment এর মাপকাঠির অর্ন্তভুক্ত করা হয় না।[৪৩] বেতনভুক্ত কর্মসংস্থান ও নিজ কর্মসংস্থানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ন্যায় গৃহস্থালীর বা পারিবারিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকেও Employment মাপকাঠির অর্ন্তভুক্ত করা ন্যায়সংগত। কিন্তু চিরাচরিতভাবে বাংলাদেশে Employment বলতে বেতনভুক্ত ও নিজ কর্মসংস্থানকেই বুঝায়।[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে Civilian Labour Force Participation এ মহিলাদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় খুবই কম। সারনী ১·৩ এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে লক্ষ্য করা যায় যে বাংলাদেশে আদমসুমারী বছরগুলোতে (১৯৭৪ এবং ১৯৮১)

সারনী-১·৩

বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহনের সংখ্যা (শতকরা হিসেবে), ১৯৭৪-৮১

১০ বছর এবং তার উর্ধে জনগণের অর্থনৈতিক	১৯৭৪			১৯৮১		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
কর্মকান্ডে অংশগ্রহন	৬৬·০৪	৬৩·৩৭	৬৪·৭৬	৬৭·৪৮	৬৬·১১	৬৬·৮২
অসামরিক কর্মে নিযুক্ত	৮০·৪১	৪·১৩	৪৩·৮৪	৭৩·৯৩	৪·০০	৪০·৫৪
কর্মরত	৭৮·৩৭	৩·৬৭	৪৩·২০	৭৩·৯৩	৪·৩০	৪০·৫৪
বেকার	২·০৪	-	১·০৮	-	-	-
অন্যান্য	১৯·৫৯	৯৬·৩৩	৫৫·৭২	২৬·০৭	৯৫·৩৪	৫৯·২৮
গৃহস্থালীর কাজ	-	৭৬·৬১	৩৬·০৭	১·৯৬	৭৪·৫৫	৩৭·৮০
নিস্ক্রিয়	১৯·৫৯	১৯·৭৩	১৯·৬৫	২২·১১	২০·৭৯	২১·৪৮

Source: Government of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics, Statistical Pocket Book of Bangladesh 1983, P. 160.

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষের অংশগ্রহণ শতকরা ৭৩°৪ এবং ৮০°৪ এর মধ্যেই ছিল। অপরপক্ষে শতকরা মেয়েদের অংশগ্রহণ/৪°১ এবং ৪°৩ এর মধ্যে সীমিত ছিল। বাংলাদেশে কর্মরত (Employed) মহিলার সংখ্যাও খুব নগন্য। ১৯৮৪ সালে যেখানে বাংলাদেশে শতকরা ৫৩°২ জন পুরুষ কর্মরত ছিল সেখানে মহিলার সংখ্যা ছিল মাত্র শতকরা ৫°২ জন। (সারনী-১°৪)। আবার ১°৫ নং সারনী থেকে দেখা যায় যে সকল মহিলা Employed তাদের অধিকাংশই নিম্নমানের পেশায় নিযুক্ত। বাংলাদেশের উচ্চতর প্রশাসনিক পদে বা দেশের নীতিনির্ধারণে কোন মহিলা নেই বললেই চলে। কখনো কখনো মন্ত্রিপরিষদে মাত্র একজন মহিলা পূর্ণমন্ত্রী থাকেন এবং তিনি সাধারণতঃ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকেন। তাছাড়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশে যেমন থাইল্যান্ডে ও বার্মায় মহিলারা ব্যবসা কাজে নিয়োজিত থাকেন, বাংলাদেশে সেরূপ লক্ষ্য করা যায় না।[৪৫]

বাংলাদেশে চাকুরীজীবি এবং চাকুরীজীবি নয় এমন মহিলাদের প্রত্যেককেই তাদের গৃহস্থালীর নানাধরনের কাজ করতে হয়। সকল মহিলাদেরকেই দিনে প্রায় ১৪/১৫ ঘন্টা কাজ করতে হয়। তারা বিশ্রামের সময় খুব কমই পায়। অথচ গৃহস্থালীর কাজে যে শ্রম তাঁরা বিনিয়োগ করে তা জাতীয় উৎপাদনে (GDP) অবদান হিসাবে স্বীকৃত নয়।[৪৬] তাছাড়া, যেহেতু নিজ গৃহস্থালীর কাজের বিনিময়ে মেয়েরা কোন বেতন বা অর্থ উপার্জন করেনা সেহেতু গৃহস্থালীর কাজে নিযুক্ত মহিলাদেরকে Employed বা কর্মজীবি বলে গণ্য করা হয় না।

বাংলাদেশে কর্মজীবি (Employed) মহিলার সংখ্যা কম হওয়ার কতগুলো কারণ আছে। প্রথমতঃ পর্দা ব্যবস্থার কারনে মেয়েরা সহজে ঘরের বাইরে আসতে পারেনা। দ্বিতীয়তঃ তাদের মধ্যে শিক্ষার হার কম। তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-১.৪

কর্মজীবি পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা (শতকরা)

বসবাস	১৯৭৪			১৯৮১			১৯৮৪		
	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা
সমগ্র বাংলাদেশ	২৮.৭	৫৩.১	২.৬	২৭.১	৪১.১	২.৮	৩০.১	৫৩.২	৫.২
শহর	৩১.৭	৫৪.৩	৩.৭	৩০.৭	৫২.১	৩.৬	৩৪.২	৫৩.৬	৮.৪
গ্রাম	২৮.৪	৫২.৮	২.৫	২৬.৫	৪১.৬	২.৭	২১.৪	৫৩.২	৪.৮

উৎস : ১.১ সারনী দেখুন পৃষ্ঠা, ১১৪। ১৯৮৪ এর উপাত্তের জন্য দেখুন
Government of Bangladesh, Bureau of Statistics,
Statistical Pocket Book of Bangladesh 1984-85
(Dhaka, Government Press 1985), P. 165.

শহরগুলোতে শিশু রক্ষনাবেক্ষণ কেন্দ্র (Child Care Centres) নেই বললেই চলে। চতুর্থতঃ যানবাহনের অভাবের কারণে অনেক মেয়ে চাকুরী নিতে পারেনা। পঞ্চমতঃ যারা অবিবাহিত বা বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা তারা বাসস্থানের চরম অভাব বোধ করে। এই ধরনের মহিলাদেরকে বাড়ীর মালিকগণ ঘরভাড়া দিতে অনাগ্রহী থাকেন। ষষ্ঠতঃ অনেক চাকুরীতেই মেয়েদেরকে পুরুষের সমান বেতন বা সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়না।[৪৭] পরিশেষে, কর্মজীবি মহিলাদেরকে গৃহস্থালীর প্রধান কাজগুলো করতে হয়। এ সকল কারনে কর্মজীবি

Dhaka University Institutional Repository

মহিলাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। ফলে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য বিদ্যমান। এই অসাম্য মহিলাদের সামাজিক মর্যাদাকে নিম্নতর করেছে এবং তারা পারিবারিক আয়বৃদ্ধি ও জাতীয় উন্নতিতে যে অবদান রাখতে পারত তা থেকে তাদেরকে বিরত রেখেছে। অবশ্য ক্রমশঃ অর্থনৈতিক চাপে কর্মজীবি মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে।

সারনী-১.৫

কর্মজীবি মহিলাদের পেশানুযায়ী শ্রেণী বিভাগ (শতকরা হিসাব), ১৯৮০

পেশা	বাংলাদেশ	গ্রাম	শহর
পেশাজীবি ও প্রকৌশলগত	২.৪	২.১	৪.৫
প্রশাসনিক	-	-	-
করনিক	১.৫	০.৫	৭.৭
বিক্রেতা	৪.২	২.৭	৫.৭
চাকুরী	১১.৬	১১.৬	৭৪.৪
কৃষিজীবি	৪৭.৬	৫৪.৭	৪.৫
যানবাহন ও অন্যান্য উৎপাদন শিল্প	২৪.৭	২৮.২	৩.২
মোট	১০০০.০	১০০.০০	১০০.০০

Source: 1980 Manpower survey, Statistical Pocket Book, 1983. P. 173.

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক অবস্থান: (Political Status):

সমাজের অন্যান্য পরিসীমার তুলনায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশে মহিলাদের অংশগ্রহণ আরও সীমিত। এ দেশের ইতিহাসে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হবার সময় থেকেই রাজনীতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ সীমিত। বৃটিশ আমলে যখন পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হয় তখন ঐ আন্দোলনে মহিলাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল না বললেই চলে। ভারতীয় কংগ্রেসের মত মুসলিম লীগের পদসোপানে কোন মহিলার স্থান ছিলনা। অবশ্য এই দলের একটি মহিলা অংগসংগঠন ছিল এবং তা প্রধানতঃ নির্বাচনের সময় মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের পক্ষে মহিলাদের ভোট সংগ্রহের চেষ্টা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। ঐ সকল সংগঠন মহিলাদের সাধারণ অধিকার রক্ষার জন্য সক্রিয় চিন্তাভাবনা বা প্রচেষ্টা করে নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও মহিলাদের অংশগ্রহণ খুব সীমিত ছিল। খুব কম সংখ্যক মহিলাই "মুক্তিবাহিনী"তে যোগদান করেছিল।[৪৮]

বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের সকল নাগরিকের জন্য ভোটাধিকার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার বা রাজনৈতিক দল করার অধিকার লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাছাড়া সংবিধান প্রনেতাগণ মহিলাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষনের বিধান করেন। জাতীয় সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ এই ১৫ জন মহিলা সদস্যকে নির্বাচিত করেন। এই ব্যবস্থা দশ বছর বলবৎ থাকার কথা বলা হয়।[৪৯] ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতির এক আদেশে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১৫ থেকে ৩০ এ উন্নীত করা হয় এবং সময়সীমা ১০ থেকে ১৫ বছর বৃদ্ধি করা হয়।[৫০] তাছাড়া মহিলাদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ বৃদ্ধিকল্পে সরকার ১৯৭৬ এবং ১৯৭৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদে ২ জন মনোনীত মহিলা সদস্যার বিধান করে।[৫১] সরকার মহিলা সদস্যার সংখ্যা ১৯৮২ সালে ২ থেকে ৩ জনে বর্ধিত করে এবং ১৯৮৪ সালে উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভায় মহিলা মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা ৩ জনে নির্ধারিত করে।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানিকভাবে পুরুষ ও মহিলাদেরকে সমান রাজনৈতিক মর্যাদা প্রদান করা হলেও বাস্তবে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও ভূমিকা খুবই সীমিত। বাংলাদেশের নারীদের ভোটাধিকার আছে কিন্তু এটার অর্থ এই নয় যে মেয়েরা এই অধিকার ব্যবহার করে। যথাযথভাবে/এই অধিকার ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং জাতীয় নীতি নির্ধারনে সিদ্ধান্ত দেবার সামর্থ প্রভৃতি। বাংলাদেশের মহিলাদের মধ্যে এগুলোর যথেষ্ঠ অভাব। সুতরাং বিভিন্নভাবে পুরুষের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই মেয়েরা তাদের ভোট ব্যবহার করে।[৫৩]

মহিলাদেরকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সমান অধিকার দেয়া হলেও বাস্তবে নির্বাচনে মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বির সংখ্যা একেবারেই নগণ্য।[৫৪] ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২ জন মহিলা ৩টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কিন্তু জয়ী হতে পারেন নি। ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে ১৭ জন সাধারণ মহিলা প্রতিযোগিতা করেছিলেন (সারনী-১'৬)। কেউ নির্বাচিত হননি তবে উপনির্বাচনে ২ জন নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে ১৯টি আসনে মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ১১টি আসনের মধ্যে মাত্র ৫টি আসনে মহিলা বিজয়ী হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৩ জন মহিলা নির্বাচিত হন কারণ আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ৩টি নির্বাচনী এলাকা থেকে বিজয়ী হয়েছিলেন। এখানে লক্ষ্যনীয় ৩ জনের মধ্যে একজনের পরিচিতি হল তার স্বামীর এবং আরেকজনের পরিচিতি হল তার পিতার। শেখ মুজিবের কন্যা হিসাবে হাসিনার পরিচয় এবং টাংগাইলের নেতা লতিফ সিদ্দিকি ও তার ভাই কাদের সিদ্দিকির পরিচয়ে পরিচিতা লায়লা সিদ্দিকি। এখনও বাংলাদেশে রাজনৈতিক অংগনে মহিলারা কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব পরিচয় নিয়ে অবতীর্ণ হতে পারেন নি। যেমন সাজেদা চৌধুরী ও মতিয়া চৌধুরী প্রমুখ কিছু কিছু নেত্রী স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে রাজনীতিতে সক্রিয়। বলা চলে মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে বেগম মতিয়া চৌধুরী (ন্যাপ-মো) রাজনৈতিকভাবে নিজের পরিচয় নিয়ে ১৯৮৬ সালে জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। সাধারণভাবে মহিলা প্রার্থীগণ কোন নির্বাচনেই বেশী সংখ্যক ভোট পান নি। (সারনী-১'৭) তবে

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-১:৬

মহিলা রাজনীতিবিদদের জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ, ১৯৭৯

প্রার্থীর সংখ্যা			প্রতিদ্বন্দ্বি রাজনৈতিক দল/ফ্রন্টের সংখ্যা	মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দানকারী দলের সংখ্যা	দলগত ভাবে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা	স্বতন্ত্র	
মোট	পুরুষ	মহিলা				পুরুষ	মহিলা
২১২৫	২১০৮	১৭	২৯	৯	১৩	৪১৮	৪

Source: Najma Chowdhury, "Women in Politics in Bangladesh, in Situation of Women in Bangladesh (Dhaka: Ministry of Social Welfare and Women Affairs, Government of Bangladesh, 1985). P. 256.

সারণী-১:৭

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (১৯৭৯ ও ১৯৮৬) মহিলা প্রার্থীদের ভোট প্রাপ্তি
(শতকরা হিসাব)

নির্বাচন	নিম্নে	মধ্যে					উর্ধ্বে	
বছর	১%	১০%	১১%-২০%	২১%-৩০%	৩১%-৪০%	৪১%-৫০%	৫০%	মোট
১৯৭৯	৭	৬	১	৩	-	-	-	১৭
১৯৮৬	২	৫	৩	১	১	৩	৩	১৮

*একটি নির্বাচনী এলাকার তথ্য পাওয়া যায় নি।

Source: Najma Chowdhury, "Women in Politics: Impact of Religion on Women's Participation - The Case of Bangladesh", (Mimeo: Paper Presented in International Seminar on Women, Religion and Politics, (New Delhi, 14-17 August 1986), P. 15.

Dhaka University Institutional Repository

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রাজনৈতিক অংগনে মহিলাদের অংশগ্রহণ আগের চেয়ে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে (১৯৮২-৮৭) দুই প্রধান বিরোধী জোটের নেত্রী হিসাবে শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার উত্থান মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহনকে অধিকতর দৃশ্যমান করে তুলেছে। তবে নিজ কৃতিত্বে তাঁরা নেতৃত্ব অর্জন করেন নি।[৫৫] একজন করেছেন পিতৃ পরিচয়ে আরেকজন করেছেন স্বামীর পরিচয়ে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগহণ ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেলেও বর্তমান অবস্থায় জাতীয় এবং স্থানীয়— উভয় পর্যায়েই মহিলা রাজনীতিবিদগণ পুরুষ রাজনীতিবিদদের উপর নির্ভরশীল। জাতীয় সংসদে ১৯৮৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত যে পদ্ধতিতে ৩০ জন মহিলা সদস্যদের মনোনীত করা হয় তাতে তারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মত একইরূপভাবে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হতেন না। যেহেতু এসকল সদস্যা প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সংসদের আসনলাভ করতেন না সেহেতু তাদের জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে যে ভূমিকা থাকা উচিত সেটা খুবই সীমিত ছিল।[৫৬] স্থানীয় পর্যায়েও যেসকল মহিলা সদস্যদের মনোনীত করা হয় তারা নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের দ্বারা সমর্থিত। প্রত্যেক এলাকার মহকুমা প্রশাসনিক নির্বাহী অফিসার স্থানীয় চেয়ারম্যানের সংগে পরামর্শক্রমে ২ জন মহিলা সদস্যের মনোনয়ন দান করেন। স্বাভাবিকভাবেই ঐ সকল মহিলা সদস্যাগণ চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করেন না।[৫৭] অবশ্য স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে মহিলাগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকেন তবে তাদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় খুবই কম। ১৯৭৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে ১,৪০,০৪৭ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১১১ জন মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।[৫৮] প্রকৃতপক্ষে কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের ভূমিকা খুবই সীমিত। তাই এক গবেষণায় বলা হয়েছে:

Dhaka University Institutional Repository

"অনেক দেশে ইউনেস্কো ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা দেখিয়েছে যে, যদিও নারী পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক, তাদের অধিকাংশই সর্বাপেক্ষা অদক্ষ ও সর্বনিম্ন বেতনের চাকুরীতে রয়েছেন, — যেখানে দারিদ্র বিদ্যমান, নারী তার চুড়ান্ত মন্দ ফলাফল ভোগ করে, এবং খুব কম সংখ্যক নারীই নেতৃত্বের স্থান দখল করেছে বা তাদের সমাজের নীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রক্রিয়ায় কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব রেখেছে।"[৫৯]

উপসংহার:

সামগ্রিকভাবে নারী মর্যাদা বিশ্লেষনে এটাই প্রতীয়মান হয় যে দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীরা বিভিন্নভাবে শোষিত ও নির্যাতিত। এর প্রধান কারণ শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, এবং সঠিক চেতনা বিকাশের অভাব। সমগ্র দেশে নারী শিক্ষার হার খুবই নিম্ন। শিক্ষা, চাকুরী, প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণপদ, রাজনীতি ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষের চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক সকল দিক দিয়ে বাংলাদেশে নারী সমাজ শোষিত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত। সাম্প্রতিককালের নারী নির্যাতন, যৌতুকের কারনে হত্যা, নানাভাবে পাশবিক অত্যাচার, ধর্ষণ ও নানা প্রকার নারী নিপীড়নের কাহিনী এই সত্যকে আরও প্রকটভাবে তুলে ধরেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকাঃ

১. নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত কনভেনসন, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা।

২. B.N. Mukherjee, "Status of Women as Related to Family Planning," Journal of Population Research, Vol. 2, No. 1, (1975), P. 5.

৩. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Status of Women and Family Planning, (New York E/C, 6/575 Rev. Sales No. E.75 IV, 5, 1975), P. 5.

৪. খন্দকার মাওলানা মোঃ বসিরউদ্দীন, পবিত্র কোরআন ও হাদিসে রসুল (বরিশালঃ কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী, ১৩৮২ বাংলা), পৃঃ ৩৮০।

৫. এ ধরনের আরও মন্তব্যের জন্য দেখুন, Rounaq Jahan,"Women in Bangladesh,""in Women for Women (Dhaka:University Press Ltd. 1975), P. 3.

৬. অবশ্য আইনানুযায়ী বাংলাদেশে মেয়ে ও ছেলের বিয়ের বয়ঃসীমা হল যথাক্রমে ১৮ এবং ২১ বছর।

৭. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Hanna Papanek and G. Minault (eds). Separate Worlds: Studies of Purdah in South Asia, (Delhi: Chanakya Publications, 1982).

৮. Hanna Papanek, "Purdah in Pakistan: Seclusion and Modern Occupations for Women", Journal of Marriage and the Family, (August, 1971), P. 519.

৯. Khusi Kabir and Others, Rural Women in Bangladesh: Exploring Some Myths (Dhaka; Ford Foundation, 1976), P. 9.

Dhaka University Institutional Repository

১০. Papanek, "Purdah in Pakistan."

১১. S. Islam, "Women Education and Development in Bangladesh: A Few Reflections", in Role of Women in Socio Economic Development of Bangladesh (Dhaka: Bangladesh Economic Association, 1977), P. 121-131.

১২. Ellen Sattar, "Village Women At Work," in Women for Women, P. 39.

১৩. Jahan, "Women in Bangladesh", in Women for Women, P. 9.

১৪. তদেব, পৃঃ ১১।

১৫. তদেব,

১৬. Rafiqul Huda Choudhury and Nilufer Raihan Ahmed, Female Status in Bangladesh (Dhaka: Bangladesh Institute of Development Studies, 1980), p. 16.

১৭. The Constitution of the People's Republic of Bangladesh.

১৮. তদেব,

১৯. Salma Sobhan, The Legal Status of Women in Bangladesh (Dhaka: Bangladesh Institute of Law and Parliamentary Affairs, 1978), p. 5.

২০. Child Marriage Restraint (Amendment) Ordinance, 1984. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Rabia Bhuiyan. "Legal Status of Women in Bangladesh," in UN Decade for Women (1976-85), Situation of Women in Bangladesh (Dhaka: Ministry of Social Welfare and Women's Affairs, Government of Bangladesh, 1985), P. 244.

Dhaka University Institutional Repository

২১. "দেনমোহর" হচ্ছে মুসলিম আইনের অধীনে বিয়ের প্রতিদান। এটা হচ্ছে কিছু টাকা বা অপর কোন সম্পত্তি যা বিয়ের প্রতিদানে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে পাবার অধিকারী হয়। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Sk. Shaukat Mohamad, Muslim Family Laws Ordinance, 1961, (Lahore: Pakistan Law Time Publication, 1964), P. 15. ৫ হাজার টাকা জরিমানা বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা করা হয়। Rabia Bhuiyan, "Legal Status of Women." P. 238.

২২. তাছাড়া স্ত্রীর সামাজিক পরিচয়, গতিবিধি বা প্রভাবের পরিসর স্বামীর তুলনায় অতি সীমিত হওয়ায় কখনও ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের সম্মতি বা সহায়তায় এই আইনের অপপ্রয়োগ হয়ে প্রথম স্ত্রীর অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে এমন নজীরও আছে।

২৩. একটি বিশেষ গবেষণায় বাংলাদেশে যুবকদের তুলনায় বয়স্কদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর বয়সের সাধারণ তারতম্য অধিক (২০ বছর) লক্ষ্য করা গেছে। দেখুন, Ellen Sattar, Women in Bangladesh: A Village Study, (Dhaka: The Ford Foundation, 1974), P. 24.

২৪. বহু ক্ষেত্রে গ্রামে বিয়ে রেজিষ্ট্রি হয় না। ১৯৬৮ সালে এক গবেষণায় দেখা গেছে গ্রামে শতকরা ৩০ ভাগ বিয়েই রেজিষ্ট্রিকৃত নয়। দেখুন, S.A. Qadir, "Modernization of an Agrarian Society: A Sociological Study of the Operation of the Muslim Family Laws Ordinance and the Conciliation Courts Ordinance in East Pakistan," Rural Sociology Research Report No. 1, (Bureau of Agricultural, Statistical Research, Agricultural University, Mymensingh, 1968).

২৫. বাস্তবে অসম্ভবতার কিছু উদহারনের জন্য দেখুন, Rabia Bhuiyan, "Legal Status of Women," P. 239.

২৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদঃ সাধারণ সম্পাদিকার রিপোর্ট, ১৯৮৪, পৃঃ ১১।

২৭. The Family Courts Ordinance, 1985, এই আইনে বলা হয়েছে যে পারিবারিক কোর্টে প্রধানতঃ মুসলিমগণই বিচারমন্ডলী হবেন। এই ধরনের কোর্টে বিয়ে, তালাক, মেয়েদের স্ত্রী হিসাবে অধিকার, সন্তানের প্রতিপালন প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া হবে। এই ব্যবস্থা গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের জন্যই প্রধানতঃ করা হয়েছে। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Rabia Bhuiyan, "Legal Status of Women," P. 245.

Dhaka University Institutional Repository

২৮. See, Dissolution of Muslim Marriages Act of 1939 and Muslim Family Laws Ordinance of 1961.

২৯. Sobhan, The Legal Status of Women.

৩০. D.F. Mullah, Principles of Mohammedan Law, (Bombay: M.M. Tripathi Pvt. Ltd. 1972), p. 70.

৩১. Aeysha Noman, Status of Women and Fertility in Bangladesh (Dhaka: University Press Ltd. 1983), pp. 39-55.

৩২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Rabia Bhuiyan, "Legal Status of Women in Bangladesh."

৩৩. The Constitution, Article 17.

৩৪. উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে যারা কোনরকমে নামস্বাক্ষর করতে পারে তাদেরকেও শিক্ষিতের মধ্যে গণনা করা হয়। এই হিসেবে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে প্রাথমিক স্তরেই মেয়েদের শিক্ষার হার বেশী।

৩৫. S. Islam, "Women Education and Development in Bangladesh: A Few Reflection." pp. 121-131.

৩৬. Mahmuda Islam, "Female Primary Education in Bangladesh" in Women and Education (Dhaka: Women for Women, 1978), p. 75.

৩৭. Alamgir Susan Fuller. Profile on Bangladesh Women (US AID Mission of Bangladesh), Appendix-1.

৩৮. A Germaine, Women's Roles in Bangladesh: A Program Assessment (Dhaka: The Ford Foundation, 1976).

৩৯. Mirium Miller (ed). Third World Women, UNICEF News Issue 76, July 1973. p. 6.

Dhaka University Institutional Repository

৪০. Ellen Sattar, "Village Women At Work." in Women for Women, P. 39.

৪১. The Constitution, Articles 20 and 29.

৪২. Qazi Khaliquzzaman Ahmad, "Female Employment in Bangladesh: A Review of Status and Policy." in UN Decade, Situation of Women in Bangladesh, P. 20.

৪৩. ঐদেক।

৪৪. ঐদেক।

৪৫. R.H. Chaudhury, "Married Women in Non-Agricultural Occupations in a Metropolitan Area of Bangladesh - Some Issues and Problems," The Bangladesh Development Studies, Vol. V, No. 2 (April 1977), P. 167.

৪৬. Ayesha Noman, Status of Women, P. 19.

৪৭. ঐদেক, See also Chaudhury and Ahmed, Female Status, pp. 65-66.

৪৮. Chaudhury and Ahmed, Female Status, p. 19.

৪৯. The Constitution, Articles 65-66.

৫০. Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978, Bangladesh Gazette Extra Ordinary, February 18, 1978.

Dhaka University Institutional Repository

৫১. Local Government Ordinance, 1976, and Paurashava Ordinance, 1977, Bangladesh Gazette Extraordinary, November 22, 1976 & June 27, 1977 respectively.

৫২. Local Government (Upazila Parishad and Upazila Administration Reorganization) Ordinance 1982 and Paurashava Amendment) Ordinance 1984, Bangladesh Gazette Extra Ordinary, December 23, 1982& February, 1, 1984 respectively.

৫৩. Najma Choudhury, "Women in Politics in Bangladesh", in UN Decade: Situation of Women in Bangladesh, p. 254, Also see her "Women's Participation in Political Process in Bangladesh: Nature and Limitations," in Women and Politics in Bangladesh (Dhaka: Centre for Women and Development, 1985), pp. 1-44.

৫৪. Najma Choudhury "Women in Politics in Bangladesh, pp. 256-257.

৫৫. তদেব, পৃঃ ২৬৫।

৫৬. তদেব, Also See Razia Faiz, "Experience of A Women Politician", in Women and Politics in Bangladesh, p. 16.

৫৭. Najma Choudhury, "Women in Politics in Bangladesh", p. 261. See also Bilquis Ara Alam, "Women's Participation in Local Government in Bangladesh", in Women and Politics in Bangladesh, প্রাগুক্ত, pp. 21-28.

৫৮. Najma Chowdhury, "Women in Politics", প্রাগুক্ত।

৫৯. Women's Studies International, No. 2, July 1982. p. 24. Cited in Najma Choudhury "Women in Politics in Bangladesh" (and translated by the writer) p. 267.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে নারী সংগঠনের বিবর্তন

বাংলাদেশের নারী সমাজ যে পশ্চাদপদ অবস্থার মধ্যে বসবাস করছে তা থেকে নারী সমাজকে মুক্ত করার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন থেকেই আন্দোলন শুরু হয়েছে। গড়ে উঠেছে বিভিন্ন "নারী সংগঠন"। "নারী সংগঠন" বলতে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানকেই বুঝায় যেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য "নারী উন্নয়নের" বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রদত্ত একটি সাম্প্রতিক সংজ্ঞা অনুসারে "নারী উন্নয়ন" হলো (১) এমন এক পদ্ধতি (২) যে পদ্ধতিতে মহিলাদের জন্য জীবনের আবশ্যকীয় প্রয়োজনগুলো যেমন খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, ও শিক্ষার পরিবেশ ও ব্যবস্থা থাকে, (৩) সম্পদ সমভাবে বন্টনের ব্যবস্থা থাকে এবং (৪) দেশের নীতি নির্ধারনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মহিলাদের নাগরিক হিসেবে ব্যক্তিগত ভাবে ও যৌথভাবে অবদান রাখার সুযোগ থাকে।[১] মহিলা উন্নয়ন কল্পে সমগ্র বিশ্বব্যাপী আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলনের ধারা উপমহাদেশে ও বাংলাদেশেও প্রবাহিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে মূলতঃ এসব আন্দোলনের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

নারী উন্নয়ন ও সম অধিকারঃ আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা

নারী উন্নয়ন কল্পে বিশ্বে নারী আন্দোলনের ধারা প্রধানতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে শুরু হয়। তবে পুরুষের সমান অধিকারের দাবীতে

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই বেশ কিছু সংগঠন গড়ে উঠেছিল। এসব সংগঠনের মধ্যে ১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন, ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল এলায়ান্স অব উইমেন, ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন অব ক্যাথলিক উইমেন, ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল লীগ ফর পীস এন্ড ফ্রিডম, ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেন, ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব বিজনেস এ্যান্ড প্রফেশন্যাল উইমেন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির ঠিক পর পর অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের ১লা ডিসেম্বর ৮৮০ জন সদস্য নিয়ে "বিশ্ব গণতান্ত্রিক নারী ফেডারেশন" (WIDF) নামে একটি আন্তর্জাতিক নারী সংগঠনের জন্ম হয়। এই সংগঠন নারী মর্যাদার প্রশ্নটিকে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলীর আলোকে বিচার করতে থাকে। এই সংস্থার ঘোষণায় বলা হয় যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে সকল নারীকে WIDF একত্রিত করতে চায় যেন তারা নাগরিক হিসেবে, মা হিসেবে, শ্রমিক হিসেবে অধিকার আদায় করতে পারে, শিশুদের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারে এবং শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে পারে। এই সংগঠন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে নারীর অধিকার রক্ষার সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থা— জাতিসংঘও বিশ্বে নারী উন্নয়ন কল্পে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করার সময় থেকেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সনদ ও দলিল রচিত হয়েছে। ১৯৪৫ সালের জাতিসংঘ সনদ, ১৯৪৭ সালে

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ সভায় স্বীকৃত নারীর প্রতি পুরোনো ধ্যান ধারনা দৃষ্টিভংগি সম্বলিত আচার আচরণ ও আইনের নির্মূলকরণ সংক্রান্ত ঘোষণা এবং ১৯৬৩-৮৫ পর্যন্ত বিভিন্ন সভায় ও ঘোষণায় নারীর প্রতি প্রদর্শিত সকল বৈষম্য দূর করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আনুর্জাতিক গণতান্ত্রিক নারী ফেডারেশনের সহযোগিতায় জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে নারীবর্ষ ঘোষণা দিয়েছিল। ১৯৭৯ সালের ৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরনের অবসান ঘটানোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত কনভেনসন" অনুমোদিত হয়। সকল ব্যাপারে এবং সকল ক্ষেত্রে নারীর সম অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ২০টি ধারা বা বিধান সম্বলিত এই কনভেনসনটিতে আইনসিদ্ধ পদ্ধতি ও আনুর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিমালা এবং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।[২] রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং জনজীবনে নারী সমাজের জন্য সম অধিকার, শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও অভিন্ন পাঠ্যসূচী নির্বাচনের অধিকার, কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ ও বেতন ভাতার ব্যাপারে বৈষম্যনীতির অবসান, বিবাহবন্ধন ও মাতৃত্বের কারণ সত্ত্বেও চাকুরীর নিশ্চয়তা ইত্যাদি বিষয়ে কনভেনসনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থার বিধান করা হয়েছে। পারিবারিক মংগল ও সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে কনভেনসনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পারিবারিক কর্তব্য সম্পাদন, কর্মস্থলের দায় দায়িত্ব পালন এবং সামাজিক ও জনজীবনে অংশগ্রহণ সুগম, সহজসাধ্য করার জন্য সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, বিশেষতঃ শিশু পরিচর্যার সুযোগ সৃষ্টির উপর কনভেনসনে জোর দেয়া হয়েছে।[৩] এভাবে জাতিসংঘে নারী মুক্তির জন্য

Dhaka University Institutional Repository

একটি জোরালো ঘোষণা অনেক দেশেই প্রভাব সৃষ্টি করেছে। জাতিসংঘ এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার ফলে জাতিসংঘের অর্ন্তভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ এসব ঘোষনার প্রতি অন্ততঃ নীতিগতভাবে সমর্থন জানিয়েছে। তাছাড়া, এসব ঘোষনা বাস্তবায়নের জন্য এসব দেশের নারী সংগঠন ও নারী সমাজ দেশের সরকারের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

উপমহাদেশে নারী আন্দোলনের ধারা:

বিশ্ব সংস্থায় বা বিশ্বে নারীমুক্তির আন্দোলন বিংশ শতকে আরম্ভ হলেও উপমহাদেশে এই আন্দোলন শুরু হয়েছে আরও অনেক আগে। উনিশ শতকে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ চিন্তাবিদগণ সমাজ তথা দেশের উন্নয়নের জন্য নারী শিক্ষার প্রসার ও নারীমুক্তির আবশ্যকীয়তা তাদের লেখনীতে তুলে ধরেন। এ সকল চিন্তাবিদদের মূল লক্ষ্য ছিল: (১) স্ত্রী শিক্ষা বা নারী শিক্ষা (২) নারীর পর্দা ও অবরোধ প্রথা এবং (৩) বিয়ে তালাক, বহুবিবাহ, বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে ধর্মীয় বিধান নিয়ে তর্কবিতর্ক ও সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন। রাজা রামমোহন রায় "কৌলিন্য" প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এবং বিধবা বিবাহ চালু করার জন্য আন্দোলন করেন। ফলে ১৮৫৫ সালে পাশ হয় বিধবা বিবাহ আইন (Widow Remarriage Act)। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষনার জন্য সংগ্রাম করে জয়ী হন। ১৮২৯ সালে সতীদাহ নিষিদ্ধ হয়। তিনি এবং বিদ্যাসাগর কেবলমাত্র কুসংস্কার দুরীভূত করার জন্যই নয়, বরং হিন্দু মহিলাদেরকে শিক্ষিত করার জন্যও চিন্তাভাবনা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত তাদেরই প্রচেষ্টায় মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় "বেথুন কলেজ"। হিন্দু সমাজের আরও কিছু কুসংস্কার দুরীকরনের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য তারা "ব্রাহ্মো আন্দোলন" শুরু করেন। এই আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠা করেন "ব্রাহ্ম সমাজ।" এই সমস্ত প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দু "পর্দা ব্যবস্থার" অনুরাল থেকে মহিলাদের মুক্ত করা।[৪]

উপমহাদেশে হিন্দু সমাজের মত মুসলমান সমাজেও নারী মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়। তবে যেখানে হিন্দু সমাজে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রধান অগ্রদূত ছিলেন কয়েকজন খ্যাতিসম্পন্ন পুরুষ সেখানে মুসলিম সমাজে নারী মুক্তির অগ্রদূত ছিলেন একজন মহিলা - বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি প্রধানতঃ বিংশ শতাব্দীর বিশ এবং ত্রিশ দশকে প্রথম মুসলিম সমাজে আন্দোলন শুরু করেন। আর তাঁর আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল নারী শিক্ষার প্রসার।[৫] চাকুরী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরুষের সংগে মেয়েদের সমমর্যাদার প্রশ্ন তখনও উত্থাপিত হয় নি। প্রথম দিকে অনমনীয় পর্দা ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে বেগম রোকেয়া মুসলিম মেয়েদেরকে শিক্ষিত করে তোলার আন্দোলন শুরু করেন। তার ধারনা ছিল যে একমাত্র শিক্ষিত হলেই মেয়েদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি আসবে। তিনি বিভিন্ন গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস রচনার মাধ্যমে, নারী পুরুষের ব্যবধানকে তুলে ধরেন। তিনি মনে করতেন শিক্ষা বিস্তারই সকল অত্যাচার নিবারনের একমাত্র মহৌষধ। তাই তিনি ১৯১১ সালে মাত্র ৮ জন ছাত্রী নিয়ে প্রথম মহিলা স্কুল কলকাতায় স্থাপন করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় (১৯৩২) ঐ স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা দাড়ায় ১২৩ জন। বেগম রোকেয়া "মতিচুর", "পদ্মরাগ", "অবরোধবাসিনী", "সুলতানার স্বপ্ন" প্রভৃতি গ্রন্থে যেসব গল্পকাহিনী ও সত্য ঘটনা বর্ণনা করেন সেগুলোর লক্ষ্য ছিল বাঙালী মুসলিম নারীদের মুক্তি। যেমন, তার রচনার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন

Dhaka University Institutional Repository

"আমরা উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে সমাজও উন্নত হইবেনা। যতদিন আমরা আধ্যাত্মিক জগতের পুরুষের সমকক্ষ না হই, ততদিন পর্যন্ত উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। আমাদিগকে সকল প্রকার জ্ঞান চর্চা করিতে হইবে।"[৬] বেগম রোকেয়া শিক্ষা বিস্তার ছাড়াও আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে ১৯১৬ সালে "আঞ্জুমান খাওয়াতীনে ইসলাম" নামে একটি মহিলা সংগঠন গঠন করেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে বেগম রোকেয়া মুসলিম বিবাহ ও পারিবারিক আইনের পরিবর্তন করে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি বহু বিবাহ প্রথার ঘোর বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই সংস্থা বহুদিন ধরে অনেক সমাজহিতকর কাজ করেছে।[৭]

বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর পর থেকে পাকিস্তানসৃষ্টি পর্যন্ত আর কোন উল্লেখযোগ্য মহিলা সংগঠন বৃটিশ আমলে জন্মলাভ করেনি। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় বাংলাদেশের মেয়েরা নিজেদের আত্মরক্ষার লক্ষ্যে ১৯৪২ সালে একটা সমিতি গড়ে তোলেন। তার নাম ছিল "আত্মরক্ষা সমিতি।" ফ্যাসিষ্ট তৎপরতায় সমগ্র ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু হলে মেয়েদের উপর নানা ধরনের অত্যাচার নিপীড়ন শুরু হয়ে যায়। অবশ্য সৈন্যদের দ্বারা নারী অত্যাচারের কথা সংবাদ নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে প্রকাশিত হতো না। এসব অত্যাচারের প্রতিরোধ করা, ফ্যাসীবাদ বিরোধী লড়াই সংগঠিত করা, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা — এই সব লক্ষ্য নিয়েই মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় যেমন, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, রাজশাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, সিলেট, রংপুর, যশোহর, চট্টগ্রাম, ও খুলনা সর্বত্রই এই সংগঠন মহিলাদের জাগরিত ও সংগঠিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সভা, আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এ সকল আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে আশা চক্রবর্তী, জুইফুল বসু (রায়), সরযূ সেন, নিবেদিতা চৌধুরী (নাগ), মনোরমা বসু এবং হেনা দাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ও পরবর্তী সময়ে অভাব ও দারিদ্রের ফলে বহু পরিবারে ভাংগন সৃষ্টি হয়। সন্তান বিক্রি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। শিশু মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। তাই মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সমগ্র বাংলার সমাজ জীবনের পুর্ণগঠনের কাজ শুরু করে। সাধারণ মেয়েদের জীবন রক্ষাকল্পে সমিতি আশ্রয় শিবির, দুধ বিতরণ ও শিশুপালন কেন্দ্র ইত্যাদি পরিচালনা, কুটির শিল্প, মাছ ধরা, কাপড় ও জাল বোনা, সুতা কাটা প্রভৃতি কাজের ব্যবস্থা করে।[৮] দুর্ভিক্ষের কারনে নারী নির্যাতন, নারী পাচার, অভাবী মেয়েদের প্রলোভিত করে দেহ ব্যবসায় নিয়োজিত করার ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে। আত্মরক্ষা সমিতি এ সকল নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং সম্মিলিত ভাবে সভা, প্রচার আন্দোলন, প্রতিবাদ আন্দোলন করে। এসব কাজের মধ্য দিয়ে আত্মরক্ষা সমিতি দেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত নারীদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করেছিল।

নারী সংগঠনের ধারা ও বৈশিষ্ট্যঃ পূর্ব পাকিস্তান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার কয়েক বছরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। বৃটিশের শাসনমুক্ত ভারতবর্ষ ধর্ম ভিত্তিতে ঐ বছরই "ভারত" ও 'পাকিস্তান" — এই দুই দেশে বিভক্ত হয়ে যায়। বিভাগ পূর্বকালে এদেশের প্রায় সর্বত্রই মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির শাখা বিস্তারিত হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বে-আইনী ঘোষণা করা হয়।[৯] অন্যদিকে, পাকিস্তান সরকার নিজ উদ্যোগে

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা সংগঠন গড়ে তুলেন। এই সংগঠনের নাম ছিল "নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি" বা আপওয়া। কিন্তু সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত আপওয়ার বিস্তৃতি সাধারণ মহিলাদের মধ্যে অতি সীমিত ছিল। তবে এই সংঘের শাখা সারা দেশব্যাপী অর্থাৎ প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় ছিল। এই সংগঠনের সংগে সরকারের নিবিড় যোগাযোগ ছিল এবং নেতৃত্ব মূলতঃ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।[১০] ১৯৫০ সালে এই সংগঠনের পূর্ব পাকিস্তান শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা হয়েছিল গভর্ণর হাউসে। বলা বাহুল্য এটা সমাজের এলিট মহিলাদেরই ক্লাব ছিল। মুষ্টিমেয় সরকারী অফিসারদের স্ত্রীদের নিয়ে এই সংগঠন সরকারী অনুষ্ঠানগুলোতে যোগদান এবং মীনাবাজার ইত্যাদিতে ব্যাস্ত থাকতো। এটা অবশ্য অনস্বীকার্য যে ঢাকা শহরে এই সংস্থা বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ করেছিল যেমন স্কুল পরিচালনা, হস্তশিল্পের প্রসারে সহায়তা প্রভৃতি।

১৯৫০ দশকে পূর্ব পাকিস্তানে মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার এবং স্কুল ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি পায়। ফলে শিক্ষিত মহিলাদের নেতৃত্বে আরও বেশ কিছু মহিলা সংস্থার জন্ম হয়। ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে এলাকা ভিত্তিক ভাবে প্রধানত এগুলো গড়ে উঠে, যেমন "গ্যান্ডারিয়া মহিলা সমিতি" (১৯৫০), "ওয়ারী মহিলা সমিতি" (১৯৫৪), "পুরানা পল্টন মহিলা ক্লাব" প্রভৃতি। ঐ সকল সংস্থা প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট এলাকার বুদ্ধিজীবি মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হত। তাদের কার্যবিধি নিজ এলাকার মধ্যেই সীমিত ছিল। এগুলো হস্তশিল্প ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেই মূলতঃ সহায়ক হয়েছিল।[১১] অবাংগালীদের মধ্যে দুটো সংস্থা গড়ে উঠেছিল। যথা "ফালাহ মুসলিম খাওয়াতীন" এবং "বায়তুল আযকাবে সারিয়াহ।" এসব সংস্থা মূলতঃ অবাংগালী নারীদের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬০ দশকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলাদের দ্বারা আরও বেশ কিছু মহিলা সংস্থার গঠিত হয়। এদের মধ্যে "মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সমিতি" (WVA) "কর্মজীবি মহিলা ক্লাব", "জোনতা ক্লাব" (ZONTA) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯৭০ এর গোড়ার দিকে জন্ম নেয় "বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ"। তবে সংগঠনের প্রকৃত কাজ শুরু হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর। সকল সংস্থার নেতৃত্বের ধারা একইরূপ ছিল না। আবাসিক এলাকার সমিতিগুলো মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।[১২] কিন্তু APWA, WVA এবং CWC প্রভৃতির নেতৃত্ব দিতেন উচ্চ মধ্যবিত্ত মহিলারা। নেতৃত্বের এই বিভিন্ন ধারায় তৎকালীন সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছিল। তবে নেতৃত্বের ধারা ভিন্নরূপ হলেও কর্মসূচী প্রায় একইরূপ ছিল। সকলেই প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও নারী শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছিল। এলাকাভিত্তিক নারী সংগঠনগুলোর আয়ের প্রধান উৎস ছিল চাঁদা এবং সাংস্কৃতিসন্ধ্যা উৎযাপন। অপরপক্ষে, APWA, WVA প্রভৃতি সকল সংগঠন মিনাবাজার করেও সংগঠনের জন্য ফান্ড সংগ্রহের চেষ্টা করত।[১৩]

পাকিস্তান আমলে নারী সংগঠনগুলোর উদ্যোগে যে কয়টি আন্দোলন এবং প্রচার অভিযান হয়েছিল সেগুলোর উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল যানবাহন দুর্ঘটনা রোধের জন্য সক্রিয় অভিযান, মহিলাদের চলাফেরার নিরাপত্তা বিধানের দাবী ও আন্দোলন; প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত নার্সদের সংকট মোচনের জন্য সুপারিশ, দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধ, নারীশিক্ষা-সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয়ভাবে একজন করে মহিলা মন্ত্রী নিয়োগের দাবী, নির্বাচনে মহিলাদের জন্য জাতীয় সংসদে ৩টি ও প্রাদেশিক পরিষদে ৫ টি আসন সংরক্ষনের দাবী ও পারিবারিক আইন বাস্তবায়নের আন্দোলন প্রভৃতি।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

নারী সংগঠনের বিকাশ ও ব্যাপ্তিঃ বাংলাদেশ

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তানের) মহিলাগণ তাদের সমস্যা ও অধিকার সম্পর্কে আরও সচেতন হয়ে উঠে। ১৯৬৯ এর গণআন্দোলনে বহু ছাত্রী ও মহিলা নেত্রী রাজনৈতিক কারনে নির্যাতিত হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে এটা চরম আকার ধারণ করে। সকল শ্রেণীর মহিলাই এতে অত্যাচারিত, নির্যাতিত, ও নিষ্পেসিত হয়। ফলে আরও কয়েকটি সংস্থার জন্ম হয়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত নারীদের সাহায্য করার জন্য গঠিত হয় সরকারী তত্ত্বাবধানে "বাংলাদেশ নারী পুর্নবাসন সংস্থা" (BWRO)। এই সংগঠনের শাখা দেশের সর্বত্র খোলা হয়। প্রশাসনিক দুর্বলতা সত্ত্বেও এই সংগঠন বহু নারী, শিশুকে পুর্ণবাসিত করে ও বহু গরীব নারীকে প্রশিক্ষণ দান করে স্বাবলম্বী রাখার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এ ছাড়া পরবর্তী পর্যায়ে "বাংলাদেশ পুর্নবাসন কল্যান ফাউন্ডেশন" (BWRF) গঠিত হয়।[১৫]

স্বাধীনতার প্রায় পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর বাংলাদেশের নারী সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার আরও কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নারী সমস্যা অবলোকনের জন্য একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রনালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন মহিলা সংগঠনগুলোর মধ্যে সংযোগ রক্ষার্থে এবং নারী উন্নয়নের স্বার্থে সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে "বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা।" ১৯৭৬ সালে এক সরকারী আদেশে এই সংস্থার জন্ম হয়। বাংলাদেশ সরকার মনোনীত একটি নির্বাহী কমিটি দ্বারা এই সংস্থা পরিচালিত হয়। এই সংস্থার প্রধান কার্যক্রম মূলতঃ আর্থ-সামাজিক। জাতীয় মহিলা সংস্থার উদ্দেশ্য মুখ্যত নিম্নরুপ ঃ (১) নারীর অধিকার সংরক্ষন করা (২) মেয়েদেরকে হাতে কলমে কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া,

Dhaka University Institutional Repository

(৩) মেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের সুযোগ বৃদ্ধি করা। জাতীয় মহিলা সংস্থা ছাড়াও আরও কিছু সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেমন Mothers' Club of Social Welfare Directorate, Women's Cooperative of the Integrated Rural Development Programmes, Bangladesh Handicrafts Cooperatives Federations প্রভৃতি।[১৬]

স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তান আমলের প্রধান বেসরকারী মহিলা সংস্থাগুলোও নতুনভাবে সংগঠিত হতে লাগল। APWA "বাংলাদেশ মহিলা সমিতি" নাম নিয়ে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল "আওয়ামী লীগের" নেতৃত্বস্থানীয় মহিলাগণ এই সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন।[১৭] ঠিক একইভাবে Business and Career Women's Association এবং Women's Voluntary Organization পুনরুজ্জীবিত হয়। এ সকল সংস্থাতে নেতৃস্থানীয় পদগুলোতে বাংগালী মহিলাগণ অধিষ্ঠিত হন। ১৯৭০ সালে গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত "বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ"ও শক্তিশালী সংস্থা হিসেবে বিকাশ লাভ করে। স্বাধীনতা উত্তরকালে মহিলা পরিষদ বর্তমানে একটি শক্তিশালী ও কার্যকরী মহিলা সংগঠন।[১৮] মহিলা পরিষদ দেশের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সংগে সংযুক্ত।

<u>উপসংহার ঃ</u>

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে উনিশ শতকেই বাংলাদেশে নারী আন্দোলন শুরু হয়েছে। তবে এই আন্দোলন হিন্দু সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতকে মুসলিম সমাজে নারীমুক্তির আন্দোলন শুরু করেন বেগম রোকেয়া। কিন্তু তার আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল নারী শিক্ষার প্রসার। বৃটিশরা চলে যাবার পর পূর্ব পাকিস্তানে বেশ কিছু নারী সংগঠন গড়ে উঠে। কিন্তু সকল সংগঠন সার্বজনীন ছিল না। মূলতঃ একটা বিশেষ শ্রেণী ও এলাকায় এসকল সংগঠনের কার্যব্যবস্থা সীমিত ছিল। স্বাধীনতার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ও পরে বাংলাদেশে বেশ কিছু নারী সংগঠনের জন্ম হয়। এদের মধ্যে মহিলা পরিষদ অন্যতম। স্বাধীনতা উত্তর কালে মহিলা পরিষদ বাংলাদেশে সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১. দেখুন, Development and Participation: Operational Implication for Social Welfare, Proceeding of the XVIth International Conference on Social Welfare, Nairobi, Kenya, 1974 c.p. 195.

২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত কনভেনসন, জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র, ঢাকা এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা।

৩. তদেক, পৃষ্ঠা- ২।

৪. Rowshan Jahan, "Women in Bangla Literature", Women for Women, P. 235.

৫. Choudhury and Ahmed, Female Status in Bangladesh, p.150.

৬. বেগম রোকেয়া স্মরনে (ঢাকা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ১৯৮২), পৃষ্ঠা- ১৫।

৭. সেলিনা খালেক, "সমাজ সচেতন রোকেয়া", মহিলা সমাচার, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬, পৃঃ ৬

৮. মালেকা বেগম, "বাংলার নারী আন্দোলনের ইতিহাস," দেখুন, ফওজিয়া মোসলেম, নারী জাগরণ ও মুক্তি (ঢাকাঃ সুবর্ণ মুদ্রায়ণ, ১৯৮৬), পৃষ্ঠা- ৭৭।

৯. তদেক, পৃঃ ৭৮।

১০. Choudhury and Ahmed, Female Status, p. 150.

১১. তদেক, পৃষ্ঠা-২৫।

১২. Rounaq Jahan "Women in Bangladesh," in Women for Women, p. 25.

১৩. তদেক, পৃঃ ২৬।

১৪. মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩।

১৫. Choudhury and Ahmed, Female Status, p. 152.

১৬. তদেক।

১৭. তদেক।

১৮. নারী মুক্তি আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ১৯৮৩), পৃঃ ১০।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

জন্ম পটভূমি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে যেমনভাবে গড়ে উঠেছিল বিশ্ব গণতান্ত্রিক নারী ফেডারেশন (WIDF) তেমনিভাবে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে জন্ম নিয়েছিল বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। তিরিশের দশকে হিটলারের ফ্যাসীবাদ মানবতা ধ্বংস করেছিল। এর বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল দেশে দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন। ঐ সময় ফ্যাসীবাদ বিরোধী ও যুদ্ধ বিরোধী আন্তর্জাতিক মহিলা কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। তদ্রূপ ১৯৬৮-৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান যখন বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের আকাংখার প্রতিফলন হয়ে দেখা দেয় এবং যখন সকলেই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতিতে সংগঠিত হচ্ছিল তখন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীসমাজের অংশগ্রহনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হতে থাকে। তখন পর্যন্ত যেসকল নারী সংগঠন নারী সমাজের কল্যান কাজে নিয়োজিত ছিল সেসব সংগঠনের মধ্যে এমন কোন সংগঠন ছিল না যে সংগঠন রাজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে জেনারেল আয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে নারী সমাজকে সংগঠিত করতে পারত। কিন্তু তখন সমগ্র দেশে রাজনৈতিক সভা, সমাবেশ, বিক্ষোভ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নারী সমাজের মধ্যেও সামরিক শাসন বিরোধী চেতনা জাগ্রত হচ্ছিল। এরূপ অবস্থায় দেশের ছাত্রীসমাজ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করার জন্য নারীসমাজকে আহবান জানায়। ১৯৬৯ সালেই তৎকালীন ছাত্র আন্দোলনের নেত্রীরা বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন স্তরের মহিলাদের নিয়ে গঠন করে "মহিলা সংগ্রাম পরিষদ।" এর এক বছর পরে অর্থাৎ ১৯৭০ সালে ঐ মহিলা সংগ্রাম পরিষদ একটি পূর্ণাংগ মহিলা সংগঠন হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

"পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ" নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১]

মহিলা পরিষদ জন্মলগ্ন থেকেই গণতান্ত্রিক সংগ্রামে যুক্ত হয়ে নারী সমাজকে সচেতন করে তোলার জন্য প্রয়াসী হয়। ১৯৬৯-৭০ সালের গণ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মহিলা পরিষদের জন্ম হলেও এই সংগঠন প্রধানতঃ একটি অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করে। এই সংগঠনের নীতিমালায় বলা হয় যে মহিলা পরিষদ কোন রাজনৈতিক সংগঠন নয় অথবা এই সংগঠন কোন রাজনৈতিক দলের অংগ সংগঠনও নয়। ১২ বছরের উর্দ্ধে যেকোন মহিলা এই সংগঠনের সদস্যা হতে পারেন। যে সকল মহিলা রাজনৈতিক দলের সংগে রয়েছেন তারাও মহিলা পরিষদের সদস্যা হতে পারেন, তবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে এই সংগঠনের মঞ্চ থেকে কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের দলীয় বক্তব্য কেউ রাখতে পারবেন না। রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্ধে যে কোন মহিলা এই সংগঠনের সদস্যা হতে পারবেন। ঐ জন্মলগ্নেই মহিলা পরিষদ দাবি করেছিল যে এই সংস্থা তার নিজস্ব ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে দেশের নারী সমাজকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলবে। এটা অনস্বীকার্য যে মহিলা পরিষদ তার জন্মলগ্নে একটি আর্থ-সামাজিক মহিলা সংগঠনই ছিল। বহুল পঠিত সাপ্তাহিক বেগম-এ বলা হয় "ইসলামিক একাডেমীতে অনুষ্ঠিত এক মহিলা সমাবেশে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ নামে এক নয়া প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। পুরুষের সাথে সমান অধিকার আদায় ও মহিলাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, ও আর্থনৈতিক মুক্তির জন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের।"[২] দৈনিক পাকিস্তানেও বলা হয়, "মহিলা পরিষদ শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে ২৮ দফা দাবী সম্বলিত লক্ষ্য নিয়ে জন্ম নিয়েছে।"[৩] সংবাদে বলা হয় যে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ সকল প্রকার দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার পূর্বে মহিলা পরিষদের সংগে কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ছিল না বলেই মনে হয়। কারণ এরূপ যোগসূত্রের কোন প্রমান পাওয়া যায় নি। কিন্তু স্বাধীনতার ঠিক পর পর বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ শেখ মুজিবের আদর্শে একাত্মতা ঘোষণা করে। আরও লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো যে আনুর্জাতিকভাবে এই সংগঠনের সংগে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। স্বাধীনতার ঠিক পর পর ১৯৭২ সালে সোভিয়েত নেত্রী মিসেস নীনা পোপভ মহিলা পরিষদের সভানেত্রী বেগম সুফিয়া কামালকে একটি তারবার্তা পাঠিয়ে বলেন "বিদেশের সংগে বন্ধুত্ব ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত সোভিয়েত সমিতি সমূহের ইউনিয়ন আপনাকে আপনার পরিচালনাধীন সমিতিকে এবং সোভিয়েত ও বাঙালী জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার জন্য সমিতির সক্রিয় সদস্যগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমরা বিশ্বজনীন শান্তি, বন্ধুত্ব ও প্রগতির স্বার্থে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার ও উন্নত করার জন্য আমাদের অকৃত্রিম আকাংখা ব্যক্ত করছি।"[৫] এর কিছুদিন পর ঢাকার এক সম্মেলনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সকল প্রগতিশীল দেশসমূহের নারীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। এই সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের পত্নী মিসেস পোপভ।[৬] অতএব প্রাথমিকভাবে মহিলা পরিষদের পিছনে কোন রাজনৈতিক দল বা আনুর্জাতিক শক্তির সমর্থন লক্ষিত না হলেও পরবর্তী পর্যায়ে সোভিয়েত সমর্থিত দলগুলোর সমর্থন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় স্পষ্ট হয়ে উঠে।

মূলনীতি ও লক্ষ্যঃ

মহিলা পরিষদ কতগুলো নির্দিষ্ট মূলনীতি ও লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে। এই মূলনীতি গুলোকে প্রধানতঃ জাতীয় ও আনুর্জাতিক পর্যায়ে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় পর্যায়ঃ

জাতীয় পর্যায়ে মহিলা পরিষদের উল্লেখযোগ্য মূলনীতিগুলো হল নিম্নরূপঃ

১. নারীমুক্তি কায়েমঃ মহিলা পরিষদের ঘোষণায় বলা হয়েছে যে মহিলা পরিষদের প্রথম মূললক্ষ্য নারী মুক্তি কায়েম করা। নারী মুক্তির অর্থ হলো দেশে প্রচলিত সকল প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, শিক্ষাগত বৈষম্য, শোষণ ও নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে নারীর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার বিকাশ। অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন, স্বনির্ভর, সামাজিক সকল প্রকার নির্যাতন, শোষণ ও বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে পুরুষের সমান অধিকার লাভে সক্ষম, শিক্ষা সাংস্কৃতিক সমান অধিকার ও দায়িত্ববোধ সচেতন এবং সামগ্রিকভাবে সক্রিয় একজন নারীকেই মুক্ত নারী বলা চলে। মহিলা পরিষদ নারী মুক্তি কায়েমের সর্বোতভাবে চেষ্টা করবে বলে সংগঠনের ঘোষণায় বলা হয়।

২. নারী আন্দোলনঃ মহিলা পরিষদের দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো নারী সমাজের আশু ও জরুরী দাবীসমূহ আদায়ের জন্য নারী আনেদালন গড়ে তোলা। ভবিষ্যতের বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া, যার মাধ্যমে নারী মুক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে।

৩. সনাতন আইনের পরিবর্তনঃ মহিলা পরিষদের তৃতীয় লক্ষ্য হল বাংলাদেশের নারী সংক্রান্ত সনাতন আইনগুলোর পরিবর্তন। বিবাহ ও পারিবারিক আইন, যৌতুক আইন, উত্তরাধিকার আইন, নাগরিকত্বের আইনের পরিবর্তন দরকার। তার জন্য প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। কারণ নারীর বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী সমাজের আইন-কানুন, প্রথা এবং বর্তমান সমাজ কাঠামো। আর এই সমাজ পরিবর্তনের কাজ একমাত্র প্রগতিশীল আন্দোলনের মাধ্যমেই সম্ভব। তাই মহিলা পরিষদের নীতি হলো দেশের গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা।

Dhaka University Institutional Repository

৪. কল্যানমূলক কাজে লিপ্ত হওয়া : মহিলা পরিষদের অন্যতম লক্ষ্য হলো মহিলা কল্যান স্বার্থে বিভিন্ন সমাজ কল্যানমূলক সংগঠনগুলোর সাথে সহযোগিতা করা ও ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করা। তাছাড়া ১২ বছরের উর্ধে ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মহিলাকে সংগঠনে ও আন্দোলনে জমায়েত করা মহিলা পরিষদের লক্ষ্য।

আন্তর্জাতিক পর্যায় :

মহিলা পরিষদ কেবলমাত্র বাংলাদেশের নারীমুক্তিতেই বিশ্বাসী নয় বরং বিশ্বের অন্যান্য দেশের নারীমুক্তিতেও গভীরভাবে বিশ্বাস করে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মহিলা পরিষদের উল্লেখযোগ্য মূলনীতিগুলো হল নিম্নরূপ :

১. বিশ্বের নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বিশ্বের যে কোন দেশের নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন-সহযোগিতার নীতি অনুসরন করবে। এই সংগঠন বিশ্বব্যাপী নিপীড়িত নারী সমাজ ও সংগ্রামী মহিলাদের সাথে একাত্মতার নীতি অনুসরণ করবে বলে মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্রে বলা হয়।

২. সাম্রাজ্যবাদীযুদ্ধের তীব্র বিরোধীতা: এই সংগঠন বিশ্বযুদ্ধ তথা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের তীব্র বিরোধীতা করবে। কারণ যুদ্ধ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথকে রুদ্ধ করে দেয়, মানবজাতির ধ্বংস ও অকল্যান ডেকে আনে এবং বিশ্বের নারী সমাজের মুক্তির পথ বন্ধ করে দেয়। এসব প্রেক্ষাপটেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধীতা করা মহিলা পরিষদের একটি লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

৩. জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন : বিশ্বের সকল দেশের স্বাধীনতার সাথে বিশ্বব্যাপী নারী মুক্তির প্রশ্নটি জড়িত। সে জন্য এই সংগঠন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ দৃঢ়ভাবে সমর্থন করবে বলেও মহিলা পরিষদের ঘোষণা পত্রে উল্লেখ করা হয়।[৭]

কর্মসূচী ও দাবী :

মহিলা পরিষদের মূলদাবী হল বাংলাদেশের নারী সমাজের পূর্ণ মুক্তি অর্জন ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, আইনগত, প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করে সর্বত্র নারী সমাজের সম অধিকার প্রতিষ্ঠা, এবং সকল প্রকার সামাজিক নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে দেশের নারী সমাজকে মুক্ত করা। এই মূল দাবী ও লক্ষ্য থেকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, আইনগত ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেবার জন্য মহিলা পরিষদ কিছু কর্মসূচী ও দাবী পেশ করেছে। মূল লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই এসব কর্মসূচী ও দাবী পরিষদ গ্রহণ করেছে।[৮] এসব দাবীগুলো আলোচনার সুবিধার জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবিতে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা যায়।

সামাজিক দাবী :

মহিলা পরিষদের মূল সামাজিক দাবী হল সমাজে ও পরিবারে নারী পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তাকে পরিবর্তন করতে হবে। একজন নারী তার পূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

মানবিক মর্যাদা নিয়ে যাতে অধিকার ভোগ করতে পারে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে তার ব্যবস্থা সামাজিকভাবে করতে হবে।

বাংলাদেশের সংবিধানে "আইনের চোখে সকলেই সমান" — এই ঘোষণা থাকলেও যেসব আইন-কানুন দ্বারা এদেশের সমাজ ও পরিবার পরিচালিত হচ্ছে তাতে নারীর সম্মান প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। সামাজিকভাবে নারীর প্রতি যে দৃষ্টিভংগির পরিচয় পাওয়া যায় তাতে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। নারীর প্রতি জনগণের দৃষ্টিভংগি পরিবর্তন করতে হবে। তাই সামাজিক ক্ষেত্রে পরিষদের নির্দিষ্ট দাবী হল :

(ক) নারী হত্যা, নারী নির্যাতন বন্ধ করা,
(খ) বহু বিবাহ বন্ধ করা,
(গ) বাল্য বিবাহ বন্ধ করা, এবং
(ঘ) যৌতুক বা পণ প্রথা বন্ধ করা।

বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে নারী হত্যা ও নির্যাতন চলছে। এর অন্যতম মূল কারণ হচ্ছে যৌতুক।[৯] যৌতুক প্রথা একজন নারীর জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর। আর এই যৌতুকের জন্যই অধিকাংশ নারীকে হতে হচ্ছে অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত। নারী সমাজের দীর্ঘ সংগ্রামের পর, বহু বছর ধরে দাবী জানানোর পর আইনগত ভাবে যৌতুক বন্ধ হয়েছে, ১৯৮০ সালে। জাতীয় সংসদ প্রনীত এই যৌতুক নিরোধ আইনের আরো সংস্কার প্রয়োজন কেননা, কিছু অস্পষ্টতা ও দুর্বলতার জন্য এই আইন ইপ্সিত উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হয়নি। নির্যাতিত ও ভুক্তভোগী নারী সমাজের উপকারের উদ্দেশ্যে যৌতুক আইনকে সঠিক অর্থে পুরোপুরিভাবে বাস্তবে কাজে লাগান পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা পরিষদের অন্যান্য সামাজিক দাবী হল ঃ

(১) বিবাহ বিচ্ছেদে মেয়েদের সমান অধিকার কার্যকর করার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

(২) হিন্দু বিবাহ তালাক আইন প্রচলিত করা।

(৩) সম্পত্তিতে পুত্র কন্যার সমান অধিকার আইনতঃ বৈধ করা। হিন্দু নারীর পিতৃ/স্বামী সম্পত্তিতে অধিকার প্রদান করা।

(৪) বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও ছেলে-মেয়ে সাবালক হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালনের দায়িত্ব মায়ের উপর থাকার অধিকার প্রদান করা এবং মা পুনরায় বিয়ে করলেও অভিভাবকত্ব দাবী করতে পারেন সে নিশ্চয়তা প্রদান করা।

(৫) সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক সকল ক্ষেত্রে নারীর জীবনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।

(৬) চলা ফেরার উপযুক্ত নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা।

(৭) বাংলাদেশে মহিলাদের যেসকল সামাজিক অধিকার ও আইন স্বীকৃত আছে, সেসব আইন বাস্তবে কার্যকর হয়না। আইনত স্বীকৃত অধিকারগুলো যাতে বাস্তবে কার্যকর করা যায় তারজন্য সরকারের অধীনে মহিলাদের জন্য লিগ্যাল এইড কমিটি বা আইনজীবি সমন্বয়ে সাহায্যকারী কমিটি গঠন করা আবশ্যক। এর ফলে সমস্যা জর্জরিত ও নির্যাতিত মহিলারা বিনা ব্যয়ে তাদের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে সাহায্যলাভে সমর্থ হবে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে মেয়েরা যাতে আইনগত অধিকারগুলো কার্যতঃ ভোগ করতে পারে সেজন্য সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৮) সমগ্র দেশে মাতৃসদনের সংখ্যা অনেক বাড়াতে হবে। প্রত্যেক উপজেলায় ডাক্তার, সেবিকা, ঔষধ যন্ত্রপাতিসহ যথেষ্ট বেডযুক্ত মাতৃসদন স্থাপন করতে হবে।[১০]

অর্থনৈতিক দাবী:

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাপরিষদ মূলতঃ দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মেয়েদেরকে জনশক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজে লাগাতে বিশ্বাসী। পরিষদ দাবী করে যে দেশের একজন নাগরিক হিসেবে নিজ দেশের অর্থনীতিকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি নারী যাতে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে সে রকম পরিকল্পনা সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। মেয়েদের স্বাবলম্বী হবার সর্বপ্রকার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। যে সকল মেয়ে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত রয়েছে তাদের কর্মস্থলে বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য (আইনগত এবং বাস্তব) দূর করতে হবে। বাংলাদেশে আরো ব্যাপক সংখ্যক মেয়ে যাতে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে সরকারকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।[১১] বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোতে একজন নারীকে সংসার ও কর্মক্ষেত্রে সমান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে ঐ সকল অসুবিধা দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ প্রসংগে মহিলা পরিষদের নির্দিষ্ট দাবীগুলো হল নিম্নরূপ:

১. চাকুরীর ক্ষেত্রে মহিলাদের সমান সুযোগ ও বেতন দিতে হবে।

২. শিল্প, কৃষি সকল ক্ষেত্রেই নারী শ্রমিকদের সমান বেতন প্রদান করতে হবে।

৩. আন্তর্জাতিক শ্রম আইন অনুসারে শ্রমজীবী ও চাকুরীজীবী মহিলাদের অন্তঃসত্ত্বাকালীন ছুটি ও বিশেষ ভাতা দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. শিক্ষা ক্ষেত্রে, অফিস-আদালতে কল-কারখানায় কর্মরত মহিলাদের সন্তানের জন্য নার্সারীর ব্যবস্থা ও তাদের বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. শ্রমজীবী ও চাকুরীজীবী মহিলাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. মহিলাদের যতটুকু কর্মক্ষেত্রের সুযোগ রয়েছে সেটুকু যাতে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে সেজন্য মহিলাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্যসেবিকা নার্সিং ও শিক্ষকতায় মহিলা অধিকহারে প্রয়োগ করতে হবে। এসব কাজে মেয়েদের সুযোগ বৃদ্ধি করে মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগের পথ সহজ করতে হবে। পারিবারিক দায়িত্ব পালনে যেন কোন বাধা সৃষ্টি না হয় সেজন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. চাকুরিরত মহিলাদের লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

৯. বর্তমান হাসপাতাল সমূহে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

১০. উৎপাদনের কাজে মহিলাদের সক্রিয় করার জন্য বাস্তব পরিকল্পনা নেয়া এবং তা কার্যকর করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।[১২]

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দাবী:

বাংলাদেশের নিরক্ষরতার হার অনেক বেশী ও ভয়াবহ। শিক্ষার হার খুবই নীচে। কিন্তু শিক্ষা নারী প্রগতির অন্যতম মূল শর্ত। সমাজে মহিলাদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন নারী শিক্ষার। নারীসমাজের মাঝে শিক্ষার ব্যাপক ও বহুল

Dhaka University Institutional Repository

প্রসার সমগ্র নারীসমাজকে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলার সাথে নারীমুক্তি আন্দোলনের সাফল্য জড়িত। শিক্ষা গ্রহণকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সম-অধিকার মনে করে মেয়েদের শিক্ষালাভের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা দরকার। তাই সংগঠনের ঘোষণাপত্রে মহিলা পরিষদ শিক্ষাক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দাবিগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এগুলো হল :

(১) মহিলাদের জন্য সর্বপ্রকার শিক্ষার অবাধ ব্যবস্থা কায়েম এবং নারী শিক্ষার বহুল প্রসার করা।

(২) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করা।

(৩) সমগ্র জনগণ বিশেষ করে নারী সমাজের মাঝে নিরক্ষরতা দূরীকরনের কাজকে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হিসেবে নেয়া।

(৪) প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি, আর সেই সংগে বালক-বালিকার সহ-শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

(৫) নিরক্ষর বয়স্কা মহিলাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা কোর্স চালু করা।

(৬) উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা বিশেষ করে প্রকৌশল, চিকিৎসা, কৃষি ও ললিতকলা বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

(৭) দেশের সর্বত্র মেয়েদের জন্য আমোদ প্রমোদ সাংস্কৃতিক কেনেদ্রর ব্যবস্থা করা এবং মেয়েদের সাংস্কৃতিক মান যাতে উন্নত হয় তার পরিকল্পনা গ্রহণ করা।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দাবী ঃ

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলা পরিষদের নির্দিষ্ট দাবী হল নিম্নরূপঃ

১. শোষনমুক্ত সমাজ ছাড়া নারী সমাজের সার্বি মুক্তি সম্ভব নয় এবং এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নারী সমাজকে রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যাপকহারে অংশগ্রহণ উদ্বুদ্ধ করা।

২. কেবলমাত্র সংবিধানে নারীর সম-অধিকারের কথা ঘোষণা করাই যথেষ্ট নয়, সেজন্য বাস্তবমুখী পরিকল্পনা নেয়া।

৩. আইনসভায় নির্বাচনের সময় মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করে মহিলাদের ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে সত্যিকার প্রতিনিধি হবার সম্ভাবনা থাকে। একারনেই আইনসভায় মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে মহিলা প্রার্থী নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।[১৪]

গঠনতন্ত্র

মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্রে সংগঠনের কাঠামো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য মহিলা পরিষদের গঠনতন্ত্রের মূল ধারাটি হচ্ছে নিম্নতম পর্যায় থেকে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে নিশ্চিত করা। যেহেতু সংগঠনের মূল লক্ষ্য দেশব্যাপী নারীসমাজের মুক্তি ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা সেহেতু পরিষদের অংগসংগঠন প্রাথমিক স্তর থেকে কেন্দ্রীয় স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রত্যেকটি স্তরে সুনির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন কমিটির কাঠামো বর্ণনা

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে। মহিলা পরিষদের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলো কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি গ্রহণ করে এবং সেগুলো অন্যান্য স্তরে প্রেরিত হয়। আর কেন্দ্রে পরিষদের কাজে সহায়তা করার জন্য কিছু উপ-পরিষদ গঠন করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে পরিষদের কাঠামো ৩·১ নং ছকে দেখানো হল। মহিলা পরিষদের বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে বোঝা যায় যে এর শাখা দেশের সর্বত্র না থাকলেও বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাথমিক, আঞ্চলিক ও জেলা কমিটি আছে।

জাতীয় পরিষদ :

(ক) সর্বোচ্চ ১০০ জন সদস্যকে নিয়ে জাতীয় পরিষদ গঠিত হয়। ঘোষণা পত্রানুযায়ী কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সকল সদস্যা জাতীয় পরিষদের অনুর্ভুক্ত। প্রতি প্রশাসনিক মহকুমা থেকে অন্তত পক্ষে ১ জন করে প্রতিনিধি জাতীয় পরিষদের সদস্যা হন।

(খ) বছরে একবার জাতীয় পরিষদের সভা হয়। সাধারণ ভাবে ১০ দিন এবং বিশেষ জরুরী অবস্থায় ৩ দিনের বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় পরিষদের সভা ডাকার বিধান আছে।

(গ) কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি জাতীয় পরিষদের অধীনস্থ একটি কমিটি। কেন্দ্রীয় কমিটি কার্যকলাপের জন্য জাতীয় পরিষদের নিকট দায়ী থাকে।

মহিলা পরিষদের কাঠামো

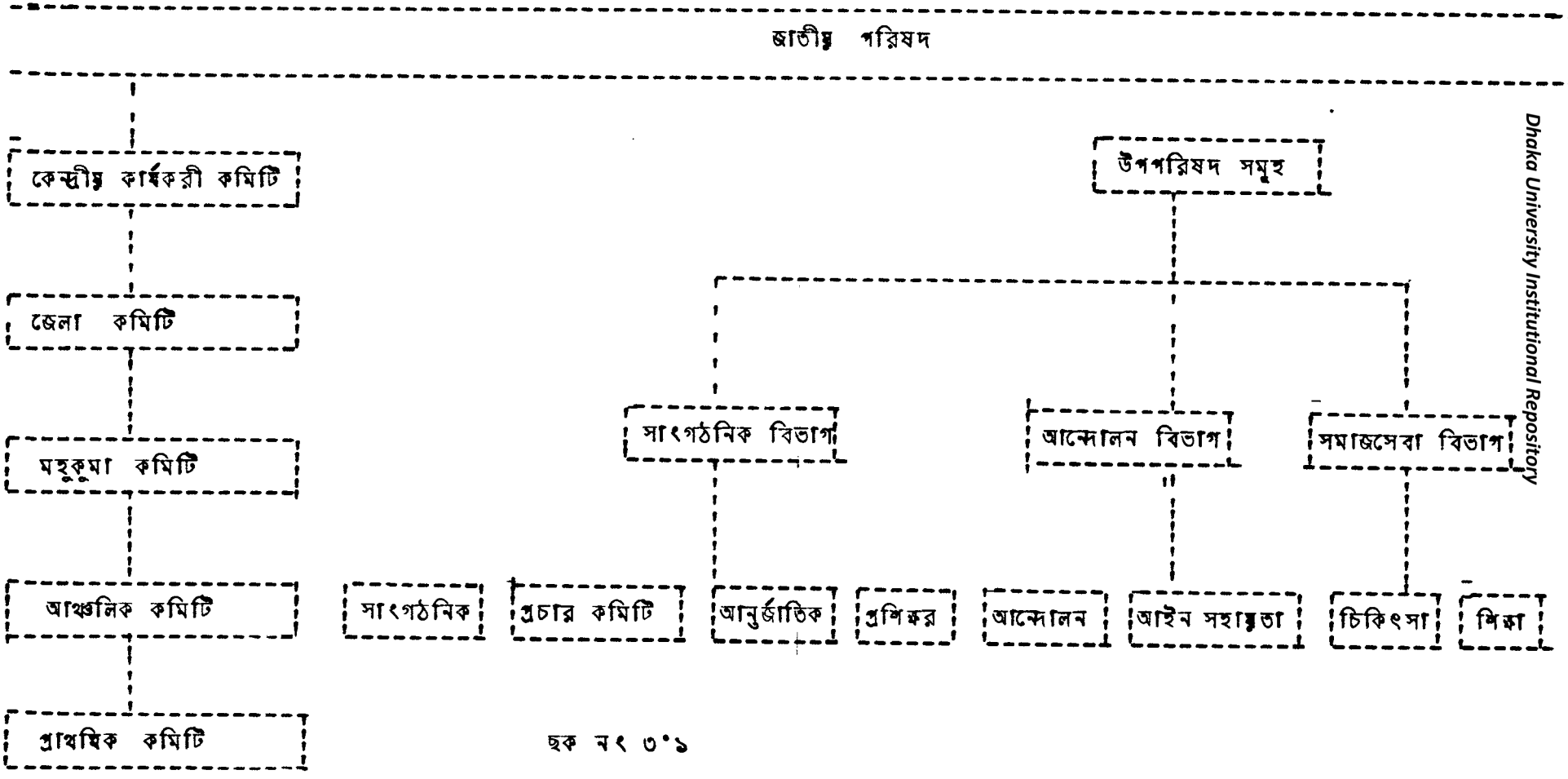

ছক নং ৩.১

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) দুই জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলনের অনুবর্তীকালীন সময়ে জাতীয় পরিষদ সংগঠনের সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে কাজ করে এবং কেন্দ্রীয় কার্যকরী কর্মধারা অনুমোদন করে। জাতীয় পরিষদ প্রয়োজনমত সংগঠনের নীতি ও কর্মধারা নির্ধারণ করে থাকে।

(ঙ) জেলা কমিটিকে ভেংগে দেয়ার ক্ষমতা জাতীয় পরিষদের রয়েছে। জাতীয় পরিষদের নিম্নতম যেকোন কমিটিকে বাতিল অথবা ভেংগে দেবার ক্ষমতা রয়েছে।

(চ) যে কোন সদস্যার বহিস্কারাদেশ অনুমোদন করার ক্ষমতা জাতীয় পরিষদকে দেয়া হয়েছে।

(ছ) কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদ মহিলাদের অন্যান্য সংগঠন ও সংস্থাকে মহিলা পরিষদের মধ্যে অনুর্ভুক্ত করনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিঃ

(ক) মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে ৩৩ জন সদস্যা নিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির গঠন কাঠামো নিম্নরূপঃ সভানেত্রী, সহ-সভানেত্রী (৭ জন), সাধারণ সম্পাদিকা, কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদিকাবৃন্দের দফতর বা দায়িত্ব (৬ জন), সদস্যা (১৭ জন)।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) প্রতি দুইমাসে অন্তঃ ১ বার কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠানের বিধান আছে। সাধারণভাবে ৭ দিন এবং বিশেষ জরুরী অবস্থায় ২ দিনের বিজ্ঞপ্তিতে সভা আহবান করা যায়। কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি তার কার্যকলাপের জন্য "জাতীয় পরিষদ" এর নিকট দায়ী থাকে। কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি জাতীয় পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করে এবং প্রয়োজনে জাতীয় পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন কর্মসূচীর পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তা কার্যকরী করে।

(গ) জাতীয় সম্মেলনের কাউন্সিলারদের মধ্যে থেকে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হন।

(ঘ) কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি প্রয়োজনবোধে জাতীয় সম্মেলনের পূর্বে ২৫ জন পর্যন্ত কাউন্সিলার জাতীয় পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কো-অপ্ট করতে পারেন।

জেলা কমিটি:

(ক) প্রতি ২৫ জন প্রাথমিক সদস্যের ভিত্তিতে ১ জন করে প্রতিনিধি মহকুমা সম্মেলন থেকে নির্বাচিত হন। এই প্রতিনিধিদের নিয়ে ২ বছর পর পর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার কথা ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) জেলা সম্মেলনে একটি জেলা কমিটি নির্বাচন হয়ে থাকে। এই কমিটির সদস্যা সংখ্যা সর্বনিম্নে ২১ জন এবং উর্ধে ২৫ জন। জেলা কার্যকরী কমিটির গঠন কাঠামো নিম্নরূপঃ সভানেত্রী, সহ-সভানেত্রী (৭ জন অথবা কমও হতে পারে), সাধারণ সম্পাদিকা, কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদিকামন্ডল (৬ জন) এবং সদস্যা (৯ জন)।

(গ) জেলা কার্যকরী কমিটির দফতর জেলার প্রধান শহরে অবস্থিত।

(ঘ) প্রত্যেক জেলা সম্মেলন হতে ১০০ জন প্রাথমিক সদস্যার ভিত্তিতে ১ জন করে জাতীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। এর যে কোন ভগ্নাংশের জন্য একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারেন।

(ঙ) ঢাকা শহরকে জেলার মর্যাদা দেয়া হবে বলে পরিষদের ঘোষণাপত্র বলা হয়েছে।

মহকুমা কমিটিঃ

প্রতি মহকুমায় একটি করে মহকুমা কমিটি গঠিত হবার কথা ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বাধিক ২১ জন সদস্যা নিয়ে মহকুমা কমিটি গঠিত হয়। মহকুমার অধীনে প্রতি প্রাথমিক থেকে ১০ জনে ১ জন করে প্রতিনিধির ভিত্তিতে সম্মেলনের মাধ্যমে মহকুমা কমিটি গঠিত হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্চলিক কমিটিঃ

কোন বৃহৎ এলাকায় একাধিক প্রাথমিক শাখা গঠিত হলে প্রয়োজনবোধে ঐ শাখাগুলোর উর্ধতন কমিটি হিসেবে একটি আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে। এরূপ আঞ্চলিক কমিটি নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হয়। ঐ অঞ্চলের প্রতি প্রাথমিক শাখার ৫ জনে ১ জন করে প্রতিনিধির ভিত্তিতে সম্মেলনের মাধ্যমে আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা যায়। আঞ্চলিক শাখায় একটি কার্যকরী কমিটি থাকে।

প্রাথমিক কমিটিঃ

কোন স্থানে কমপক্ষে ২৫ জন প্রাথমিক সদস্যা হলেই সে স্থানে প্রাথমিক শাখা গঠন করা যায়। প্রতিটি প্রাথমিক শাখায় ১১ জন সদস্যা নিয়ে একটি কমিটি গঠনের বিধান মহিলা পরিষদের ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাথমিক শাখায় সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কর্মীগণ থাকেনঃ সভানেত্রী, সহ-সভানেত্রী (৩ জন) সাধারণ সম্পাদিকা, সহ-সাধারণ সম্পাদিকা, কোষাধ্যক্ষা, সাংগঠনিক সম্পাদিকা, দফতর সম্পাদিকা, প্রচার সম্পাদিকা, সমাজ কল্যান সম্পাদিকা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা, ক্রীড়া সম্পাদিকা, এবং সদস্যাবর্গ।

উপ-পরিষদসমূহঃ

সাংগঠনিক কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্য মহিলা পরিষদে বিভিন্ন উপ-পরিষদ রয়েছে যা সাংগঠনিক, আন্দোলন ও সমাজসেবা — এই তিন মূল বিভাগের অধীনে বিন্যস্ত।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

<u>সাংগঠনিক বিভাগঃ</u> সাংগঠনিক বিভাগের অধীনে প্রধান উপপরিষদ গুলো হলোঃ সাংগঠনিক উপপরিষদ, প্রচার-প্রকাশনা উপপরিষদ, প্রশিক্ষণ উপপরিষদ এবং আন্তর্জাতিক উপপরিষদ। সাংগঠনিক উপপরিষদের মুল লক্ষ্য হলো নারীর বিরুদ্ধে সকল শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়নের অবসান। উপপরিষদ দু'টি ধারায় কাজ করে। প্রথমতঃ সংগঠনকে বাড়ানোর জন্য পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালায়। দ্বিতীয়তঃ নিয়মিত আলোচনা সভা, গ্রুপ বৈঠক, পুনঃ পুনঃ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সকল সংগঠকদের অধিকতর সচেতন ও আদর্শনিষ্ঠ হতে উদ্বুদ্ধ করে। বিভিন্ন পেশায় এবং স্তরের মেয়েদের নিজ নিজ সমস্যা ও দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে সংগঠিত করা এই উপপরিষদের কাজ। সংগঠনের শাখা বিস্তার, সদস্য সংগ্রহ, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করার চেষ্টা, [illegible] - এগুলো সবই সংগঠকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। একজন সাধারণ মহিলাকে প্রাথমিক সদস্য করা, তাঁর চেতনা ও বোধশক্তি বাড়িয়ে তাকে উদ্যোগী কর্মীতে পরিণত করা প্রধানতঃ সাংগঠনিক উপ-পরিষদের কাজ।

প্রচার প্রকাশনা উপ-পরিষদ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নীতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং সংগঠনের কর্মতৎপরতার খবর প্রচার ও প্রকাশ করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে <u>মহিলা সমাচার</u> নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন উপলক্ষে লিফলেট, বুকলেট, ক্যালেন্ডার, শুভেচ্ছাকার্ড প্রকাশ করে। এই উপ-পরিষদকে বিশেষভাবে সহায়তা করে মহিলা পরিষদের আন্তর্জাতিক উপপরিষদ। ইহা বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার প্রেক্ষিতে যেমন "পারমানবিক অস্ত্র মুক্ত বিশ্ব চাই"। "মুক্তি সংগ্রামে দক্ষিণ আফ্রিকা নারী সমাজ" প্রভৃতি পুস্তিকা প্রকাশ করে থাকে। মহিলা পরিষদ প্রশিক্ষণ উপপরিষদ নামে একটি উপপরিষদ গঠন করেছে।[১৭] এ উপ-পরিষদের মুল কাজ মহিলা পরিষদের কর্মীদের মধ্যে নারী আন্দোলন বিষয়ক

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বগত ধারণা দেয়া। তার জন্য প্রথমতঃ সংস্থা পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করে। পরবর্তীতে এই পাঠ্যসূচীর ভিত্তিতে বই প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। "নারী জাগরণ ও মুক্তি" নামে একটি বই প্রকাশ করা হয়[১৮] এবং দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই উপ-পরিষদ বিভিন্নভাবে মহিলা পরিষদের কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

আন্দোলন বিভাগ: আন্দোলন বিভাগের মূল উপ-পরিষদ হলো দু'টি, যথা-আন্দোলন উপ-পরিষদ এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও আইন সহায়তা উপ-পরিষদ। আন্দোলন উপ-পরিষদের মূল লক্ষ্য হলো নারী সমাজের বিভিন্ন সমস্যাকে সামনে রেখে জনমত সৃষ্টির জন্য আন্দোলন গড়ে তোলা। বাংলাদেশের নারীরা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। সেই সমস্যাগুলোর আশু সমাধানের জন্য সমগ্র নারী সমাজকে আন্দোলন মুখরিত করে সজাগ করাই হচ্ছে এই উপ-পরিষদের মূল লক্ষ্য।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও আইন সহায়তা পরিষদ বর্তমানে মহিলা পরিষদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংগসংগঠন। এই উপ-পরিষদ দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতনের শিকার থেকে নারীদেরকে আইনগতভাবে সহায়তা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে যে আইন প্রণীত হয়েছে তা মূলতঃ মহিলাদের সার্বিক আন্দোলনেরই ফল। কিন্তু যেহেতু আইন প্রনেতাদের শ্রেণীস্বার্থ ও নির্যাতিত নারীদের শ্রেণী স্বার্থের মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য যেজন্য সত্যিকার অর্থে এই সব আইন বাস্তবায়ন করা খুব কঠিন। এ ক্ষেত্রে আইন সহায়তা উপ-পরিষদ মহিলাদেরকে বিনা খরচে আইনগত সাহায্য করে।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজসেবা বিভাগঃ সমাজসেবা বিভাগের অধীনে প্রধান উপ-পরিষদ হলো চিকিৎসা উপ-পরিষদ এবং শিক্ষা উপ-পরিষদ। নারী সমাজের দাবী-দাওয়া আদায়ের পাশাপাশি নিরন্ন, স্বাস্থ্যহীন, সহায়-সম্বলহীন মেয়েদের মাঝে স্বাস্থ্য চিকিৎসার ব্যবস্থার দায়িত্ব চিকিৎসা উপ-পরিষদের উপরে ন্যাস্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় চিকিৎসা উপ-পরিষদ বিনামূল্যে দরিদ্র, বস্তিবাসী, ও নিম্নবিত্তদের মধ্যে সহজলভ্য চিকিৎসা দিয়ে থাকে। এ ছাড়া বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস প্রতিপালন, বিশ্ব শিশু দিবস পালন, জাতিসংঘ ঘোষিত পঙ্গু দিবস পালন করা চিকিৎসা উপ-পরিষদের কাজ।

বাংলাদেশে নারী প্রগতির লক্ষ্যে নারী সমাজের মাঝে নিরক্ষরতা দুর করা, নারী সমাজকে সচেতন করে তোলা, নানা প্রকার কু-সংস্কার ও অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত করে শিক্ষিত করে তোলার কাজ হলো শিক্ষা উপ-পরিষদের। শিক্ষা উপ-পরিষদ সাধারণতঃ তিন ধরনের কাজ করে থাকেঃ সাংগঠনিক, প্রচারমূলক এবং আন্দোলন-মূলক। বয়স্কা ও শিশু শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা, শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন করে সিলেবাস তৈরী করা, স্কুল পরিচালনার যাবতীয় ব্যবস্থা করা ইত্যাদি সাংগঠনিক কাজের আওতাভুক্ত। শিক্ষা নীতিতে নারীশিক্ষা তথা সমগ্র শিক্ষার যে ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রতি সরকারের দৃষ্টিভংগির সমস্যা, শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ বৈষম্যমূলক অবস্থা, নারী শিক্ষা ব্যহত হওয়ার পিছনে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ কাজ করছে সেসব সমস্যার বিষয়ে সঠিক ধারণা দেয়া, প্রচার করা ও জনমত গঠন করা শিক্ষা উপ-পরিষদের কাজ। এই উপ-পরিষদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সমাজে বর্তমানে অপসংস্কৃতির ফলে যে বিকৃত রুচী ও বিকৃত জীবনবোধের প্রসার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে গঠনমূলক ও প্রচারমূলক আন্দোলন গড়ে তোলা।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

সংক্ষেপে এই অধ্যায়ের সামগ্রিক আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের নারী সমাজ যে পশ্চাদপদ এবং শাসরুদ্ধকর অবস্থার মধ্যে বাস করছে তা থেকে তাদেরকে মুক্ত করার জন্যই বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচী ও দাবী নিয়ে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছে। এই দাবীগুলোর বাস্তব সার্থকতার জন্য সমগ্র দেশব্যাপী মহিলা পরিষদ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এই পরিষদ জেলা, মহকুমা, উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তুলেছে। তাছাড়া সমাজের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নের জন্য বেশ কয়েকটি উপ-পরিষদ গঠন করে তাদের উপর দায়িত্ব অর্পন করেছে।

মহিলা পরিষদের বিভিন্ন রিপোর্ট ও তথ্যের আলোকে মনে হয় যে সংগঠনটি সমগ্র দেশের সর্বস্তরে বিস্তৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে মহিলা পরিষদ কেবলমাত্র সমাজসেবামূলক ও সংস্কারমূলক সংগঠনই নয় বরং আন্দোলনের মাধ্যমে সংগঠিত উপায়ে নারীসমাজকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলা এই সংগঠনের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। পরিশেষে, এটাও লক্ষ্যনীয় যে সংগঠনটি কেবলমাত্র দেশের নারীমুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং আন্তর্জাতিক উপপরিষদের মাধ্যমে বিশ্বের নারীসমাজ ও নারী আন্দোলনের সংগে যোগসূত্র রাখতে বদ্ধপরিকর রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকাঃ

১. নারী মুক্তি আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ১৯৮৩), পৃঃ ১৩-১৪। মহিলা পরিষদের জন্মলগ্নে আরও যারা অন্যতম নেত্রী ছিলেন তারা হলেন সারাহ আলী, হামিদা কামাল হোসেন, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, মালেকা বেগম ও নূরজাহান কাদের। দেখুন বেগম ১৭ই মে, ১৯৭০।

২. বেগম, ১৭ই মে, ১৯৭০।

৩. দৈনিক পাকিস্তান, ১৮ই জুন, ১৯৭০।

৪. সংবাদ, ১৫ই জুলাই, ১৯৭০।

৫. দেখুন বেগম, ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৭২।

৬. দেখুন বেগম, ২৮শে মে, ১৯৭২।

৭. নারী মুক্তি আন্দোলন, পৃঃ ১৪।

৮. প্রাগুক্ত, এ দাবীগুলো কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে সে সম্পর্কে পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৯. ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র (ঢাকাঃ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ)।

১০. তদেক, পৃঃ ৯।

১১. তদেক, পৃঃ ১০।

১২. তদেক, পৃঃ ৭।

১৩. তদেক, পৃঃ ১১।

১৪. তদেক, পৃঃ ১২-১৭।

১৫. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ এর রিপোর্ট দেখুন, পৃঃ ৩-৪।

১৬. তদেক।

১৭. তদেক।

১৮. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, প্রশিক্ষণ উপ-পরিষদের রিপোর্ট, পৃঃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মহিলা পরিষদের নেতৃত্বের প্রকৃতি ও স্বরূপ

প্রত্যেক সংগঠনের কর্মসূচী ও দাবির সার্থকতা অনেকাংশে নির্ভর করে সেই সংগঠনের নেতৃত্বের গুনাবলীর উপর। সি,আই, বার্নার্ডের (C.I. Bernard) মতে নেতৃত্ব হলো "ব্যক্তিগনের এরূপ আচরণ গুণ যার মাধ্যমে তারা সংগঠিত কার্যপ্রচেষ্টায় জনগণকে বা তাদের কার্যকলাপকে পরিচালিত করেন।("Leadership "refers to the quality of the behaviour of individuals whereby they guide people or their activities in organized effort") আবার, Henry Hodges এর মতে নেতৃত্ব হল ব্যক্তিগত গুনাবলী যা একটি সংগঠনকে তার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে নিয়ে যায়।("Leadership is the personal quality which moves the organization to the attainment of goals.")[১] পাকিস্তান আমলে "নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি" সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেটা তেমন সার্থকতা লাভ না করার একমাত্র কারণ ছিল ঐ সংগঠন জনগণের মধ্যে সমর্থন সৃষ্টি করতে পারেনি বরং ওটা সরকার সমর্থনপুষ্ট ছিল এবং সরকারী প্রশাসনে আমলাদের পরিবারবর্গই নেতৃত্ব দিয়েছিল।[২] তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ অনেক বেশী পরিমানে সার্থকতা লাভ করেছে। সম্ভবতঃ এর কারণ হলো এই সংগঠনের নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ১৯৮৭ সালে যে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি বিদ্যমান ছিল সে কমিটির ৩০ জন সদস্যের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই সংগঠনের নেতৃত্বের প্রকৃতি অনুধাবন করা হয়েছে।[৩] ঐ সকল সদস্যাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

কোন স্তরের মহিলারা এই সংগঠনে প্রভাবশালী। মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক পরিচয় জানিতে গিয়ে বয়স, শিক্ষা, পেশা, শ্রেণী পরিচিতি প্রভৃতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বয়সঃ-

নেতৃত্ব বিশ্লেষনে যে কোন গবেষণার জন্য নেতাদের বয়স নির্ধারণ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন কারণ দেখা গেছে বয়োজ্যেষ্ঠ লোক দ্বারা যদি কোন সংগঠন পরিচালিত হয় তবে সংগঠন সমাজের আধুনিকতাগামী তথা তরুণ ও যুবকদের আশা আকাংখা পুরন করতে সক্ষম হয় না।[৪] সে জন্য দেখা যায় যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদের প্রভাবই বেশী। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন সংগঠনেও অধিকাংশই নেতাই মধ্যবয়স্কের। মহিলা পরিষদের নেতৃত্ব বয়সের অনুপাতে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। ৪°১ নং সারনীতে তাদের বয়সের তারতম্য দেখানো হলো।

সারনী- ৩°১

বয়সানুযায়ী নেত্রীদের পরিচিতি

বয়স	সংখ্যা
৩০ এর নীচে	০০(০০%)
৩০-৪০ এর মধ্যে	১৬(৫৩°৩%)
৪০-৫০ এর মধ্যে	০৮(২৬°৬%)
৫০-৬০ এর মধ্যে	০৫(১৬°৭%)
৬০ এর উপরে	০১(৩°৪%)
মোট	৩০ জন (১০০%)

উৎসঃ ফিল্ড ওয়ার্ক (বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা শতকরা হিসাব)

Dhaka University Institutional Repository

৪°১নং সারনী থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে মহিলা পরিষদে সাধারণভাবে মধ্যবয়সের নারীগণই (অর্থাৎ ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে) সংগঠনটি নিয়ন্ত্রণ করছে। আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে কেবলমাত্র একজন নেত্রীর বয়স ৬০ এর উপরে। অধিক বয়সের নারীর অনুপস্থিতির মূল কারণ সম্ভবতঃ বয়স্ক নারীগণ নারী আন্দোলনে অংশগ্রহনে আগ্রহী নয় বা অল্পবয়স্ক নারীদের সংগে প্রতিযোগিতা করে তারা নারী সংগঠনে প্রবেশের সুযোগ পান না। তাছাড়া, যে সময় মহিলা পরিষদের জন্ম হয় সেই সময় স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ঐ সময় সংগঠনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন, যাঁদের বর্তমান বয়স ৪০ এর কাছাকাছি। ঐ সমস্ত নেত্রী প্রধানতঃ বর্তমানে মহিলা পরিষদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

শিক্ষাঃ

সাংগঠনিক নেতৃত্ব দানের জন্য শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ কারনেই নেতৃত্বের প্রকৃতি বিশ্লেষনে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি দেয়া অবশ্যই প্রয়োজন। মহিলা পরিষদের নেত্রীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিচয় জানতে গিয়ে নেত্রীদের স্বামী ও পিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্যও সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সংগঠনের নেত্রীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার যে উপাত্ত পাওয়া যায় তা ২ নং সারনীতে দেখানো হল।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী- ৪°২

শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে নেত্রীদের শ্রেণীভেদ

শিক্ষার মান	নিজ শিক্ষা	স্বামী শিক্ষা	পিতৃ শিক্ষা
দশম শ্রেণী পর্যন্ত	০০(০০%)	০০(০০%)	০৪(১৩°৩%)
উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত	০৫(১৬°৭%)	০০(০০%)	০৩(১০°০%)
স্নাতক পর্যন্ত	০৫(১৬°৬%)	৩(১০%)	১৮(৬০°০%)
স্নাতকত্তোর বা তদুর্ধ	২০(৬৬°৬%)	২৭(৯০%)	০৫(১৬°৭%)
মোট	৩০ জন(১০০%)	৩০ জন(১০০%)	৩০ জন(১০০%)

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

৪°২ নং সারনী থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে মহিলা পরিষদের নেত্রীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বাংলাদেশের নারী সমাজের শিক্ষার হারকে প্রতিনিধিত্ব করে না। অধিকাংশ সদস্যাই স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর অধিকারী। দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষিত কোন নারীরই এই সংগঠনে নেতৃত্বে নেই। পরিষদের নেত্রীদের স্বামীগণ আরও শিক্ষিত। ৩০ জন সদস্যের ... মধ্যে ২০ জনের ডিগ্রী স্নাতকোত্তর কিন্তু তাদের স্বামীর ২৭ জনেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর বা তদোর্ধে। পিতাদের অধিকাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতাও স্নাতক ডিগ্রী। উল্লেখ্য যে তাঁরা যে সময় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছিলেন সেই আর্থ-সামাজিক পরিবেশে উচ্চ শিক্ষা সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলা চলে। সুতরাং সামগ্রিক ভাবে পিতৃশিক্ষা, স্বামী শিক্ষা ও নিজ শিক্ষাগত যোগ্যতার মানদন্ডে মহিলা পরিষদের নেতৃবৃন্দ সকলেই উচ্চ শিক্ষিত এবং শিক্ষাগতভাবে উন্নত পরিবারের সদস্য।

Dhaka University Institutional Repository

পেশাঃ

যে কোন সংগঠনে সামাজিক পদমর্যাদা নির্ধারনে পেশা একটি মানদন্ড। সুতরাং নেতাদের পেশাগত যোগ্যতা বিচার করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ বাংলাদেশের মহিলাদের প্রধান পেশা হচ্ছে গৃহকর্ম। কিন্তু ৪°৩নং সারনীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে মহিলা পরিষদের নেত্রীদের গৃহকর্মই একমাত্র পেশা নয়। যদিও ৩০ জনের মধ্যে ১১ জনের পেশা পারিবারিক কাজ, ১৯ জনের পেশা চাকুরী বা বৃত্তিমূলক কাজ। উল্লেখ্য যে এই ১৯ জন মহিলাও গৃহকর্মের কাজ করে থাকে। নেত্রীদের অধিকাংশেরই স্বামী চাকুরীজীবি (২১ জন) এবং ৯ জন বৃত্তিমূলক কাজে নিযুক্ত। ১২ জন পিতার

সারনী- ৪°৩

পেশানুযায়ী নেত্রীদের শ্রেণীভেদ

পেশা	নিজ পেশা	স্বামীর পেশা	পিতৃ পেশা
গৃহিনী	১১(৩৬°৬%)	০০(০০%)	০০(০০%)
চাকুরী	১৪(৪৬°৭%)	২১(৭০%)	১২(৪০%)
বৃত্তিমূলক (যেমন ব্যবসা, আইনজীবি, চিকিৎসা, প্রকৌশলী, ইত্যাদি)	৫(১৬°৭%)	৯(৩০%)	১৫(৫০%)
ভূস্বামী	০০(০০%)	০০(০০%)	৩(১০%)
অন্যান্য	০০(০০%)	০০(০০%)	০০(০০%)
মোট	৩০ জন(১০০%)	৩০ জন(১০০%)	৩০ জন(১০০%)

উৎসঃ ফিল্ড ওয়ার্ক

Dhaka University Institutional Repository

পেশা চাকুরী এবং ১৫ জনের পেশা বৃত্তিমূলক কাজ। সুতরাং পেশাগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মহিলা পরিষদের নেত্রীগোষ্ঠীর স্বামী বা পিতা মর্যাদাপূর্ণ পেশায় নিযুক্ত। গৃহকর্মের সাথে তাঁরা উল্লেখযোগ্য পরিমান সময় পরিষদের কার্যক্রমে লিপ্ত থেকে সমাজসেবায় ব্যয় করতে সক্ষম হচ্ছেন। স্বামীর পেশাগত দিক থেকে আর্থিক অবস্থান তাঁদের নিজেদের সমাজসেবায় সংযুক্ত রাখতে সহায়তা করছে নিঃসন্দেহে।

মাসিক আয়ঃ

শিক্ষা ও পেশা সংক্রান্ত তথ্যগুলো থেকে প্রমানিত হয় যে বাংলাদেশের সাধারণ নারীসমাজের চেয়ে মহিলা পরিষদের নেত্রীগোষ্ঠীর আয় বেশী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ৪০৪নং সারনীতে মহিলা পরিষদের নেত্রীদের মাসিক আয়ের তথ্য দেয়া হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ নেত্রীরই নিজ আয়ের পরিমান ২ হাজার টাকার উর্ধে। তবে লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হলো যে অধিকাংশ নেত্রীর স্বামীর (২০ জন) আয় ৪ হাজার টাকার উর্ধে। এ দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ করলে বলা চলে মহিলা পরিষদের নেতৃত্ব প্রদানকারী গোষ্ঠি অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল আর্থিক অবস্থার অধিকারী। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে নেত্রীদের নিজস্ব ও পারিবারিক আর্থিক অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য কিছুটা রক্ষণশীল হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

নেত্রীদের শ্রেণী পরিচিতিঃ

মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্যাদের ৫টি শ্রেণীতে চিহ্নিত করে (ধনী, উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও গরীব) প্রশ্ন করা হয়েছিল তাঁরা নিজেকে কোন শ্রেণীভুক্ত মনে করেন। তাঁদের শ্রেণী পরিচিতি সম্পর্কে নিজস্ব

Dhaka University Institutional Repository

সারনী- ৪°৪

আয় অনুসারে নেত্রীদের শ্রেণীভেদ

আয় (টাকায় মাসিক হারে)	নিজ আয়	স্বামীর আয়	পিতৃ আয়
১,০০০ এর নীচে	১২(৪০°০০%)	০০(০০%)	০৩(১০%)
১,০০০-২,০০০	২(৬°৭%)	০০(০০%)	০৩(১০%)
২,০০০-৩,০০০	৬(২০°০০%)	০২(৬°৭%)	০৪(১৩°৩%)
৩,০০০-৪,০০০	৬(২০°০%)	০৮(২৬°৭%)	০৪(১৩°৩%)
৪,০০০-৫,০০	২(৬°৭%)	১০(৩৩°৩%)	০১(৩°৩%)
৫,০০০ এর উপরে	১(৩°৩%)	১০(৩৩°৩%)	০৫(১৬°৭%)
তথ্য পাওয়া যায়নি	১(৩°৩%)	০(০০%)	১০(৩৩°৩%)
মোট	৩০ জন(১০০%)	৩০ জন(১০০০%)	৩০ জন (৯৯°৯৯%)

উৎসঃ ফিল্ড ওয়ার্ক।

মূল্যায়ন থেকে দেখা গেছে যে ৩০ জনের মধ্যে ১৫ জন মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত, ১০ জন উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত এবং ৫ জন নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত বলে নিজেদের চিহ্নিত করেন (সারনী-৪°৫)। যেহেতু এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর অনেকাংশে উত্তরদাতার আত্মিক দৃষ্টিভংগির উপর নির্ভর করে, অনুমান করা যেতে পারে নিজ অবস্থানের নিম্ন-মূল্যায়ন করার প্রবণতা বিদ্যমান থাকা অস্বাভাবিক নয়। লক্ষ্যনীয় যে এসকল নেত্রীদের মধ্যে কেউ নিজেকে ধনী সম্প্রদায়ভুক্ত বা গরীব সম্প্রদায়ভুক্ত বলে দাবী করেন নি।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-৪°৫

শ্রেণী পরিচিতি সম্পর্কে সদস্যাদের নিজ মূল্যায়ন

শ্রেণী	সংখ্যা
ধনী	০০(০০%)
উচ্চ মধ্যবিত্ত	১০(৩৩°৩%
মধ্যবিত্ত	১৫(৫০%)
নিম্নমধ্যবিত্ত	৫(১৬°৭%)
গরীব	০০(০০%)
মোট	৩০ জন (১০০০%)

উৎসঃ ফিল্ড ওয়ার্ক

নেত্রীদের দলীয় আনুগত্যঃ

বাংলাদেশে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলো সাধারণত, কোনা না কোনভাবে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যোগসূত্র বজায় রাখে। কোন বিশেষ দলের প্রতি ঐসকল সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন না থাকলেও সংগঠনগুলির নেতৃত্বের রাজনৈতিক মতাদর্শ বা বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য থাকতে পারে। মহিলা পরিষদের নেতৃগণও এর ব্যতিক্রম নন। ৪°৬ নং সারনীতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্যাদের অধিকাংশেই কোন না কোন দলের সংগে যোগসূত্র আছে। মোটামুটি সকলেই বলেছেন যে তারা দেশের প্রগতিশীল বা বামপন্থী দলগুলোর সমর্থক। বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে বেশীর ভাগই ন্যাপ বা কম্যুনিষ্ট পার্টির সমর্থক। মহিলা পরিষদ কোন রাজনৈতিক দলের অংগসংগঠন কিনা এ প্রশ্নের জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে মহিলা পরিষদ কোন রাজনৈতিক দলের সংগে সম্পৃক্ত নয়। তবে তাঁদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সমর্থন বা অনুগত্যের তথ্য সংগ্রহে দেখা যায় যে অধিকাংশ নেত্রীই প্রগতিশীল

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক দলের সমর্থক এবং কেউ কেউ (৫ জন) রাজনৈতিক দলের সদস্যও বটে।

সারনী-৪.৬

নেত্রীদের দলীয় আনুগত্য

দলীয় যোগসূত্র	সংখ্যা
রাজনৈতিক দলের সংখ্যা	৫(১৬.৭%)
রাজনৈতিক দলের সমর্থক	২০(৬৬.৬%)
সদস্যা নয়, সমর্থকও নয়	০৫(১৬.৭%)
মোট	৩০ জন (১০০%)

উৎস : ফিল্ড ওয়ার্ক

নারী উন্নয়ন ও মহিলা পরিষদঃ

নারী উন্নয়নে মহিলা পরিষদ কি ভূমিকা রেখেছে এ প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ নেত্রীর জবাব থেকে কতগুলো সাধারণ সূত্র পাওয়া গেছে। তাদের মতে মহিলা পরিষদ সাধারণভাবে নিম্নলিখিত কাজগুলো করেছেঃ

১. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করা।

২. যৌতুক, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তুলে আইন পাশ করা এবং এর জন্য চাপ সৃষ্টি করা।

৩. নির্যাতিত মহিলাদের মামলা চলাকালীন স্বল্পমেয়াদী বাসস্থান দেয়া।

৪. নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরনে জাতিসংঘের সনদ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টি করা।

৫. সমাজ কল্যানমূলক কাজে যেমন - বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, সেলাই শিক্ষাকেন্দ্র ও দাতব্য চিকিৎসালয় চালু করা।

Dhaka University Institutional Repository

৬. নির্যাতিত নারীদের আইনের সহায়তা দান করা।

৭. প্রচার, প্রকাশনা র‍্যালী, বিক্ষোভ মিছিল, প্রেস কনফারেন্স, সংবাদপত্রে বিবৃতি দেয়া, মামলা দায়ের করা, চাপ সৃষ্টি করা প্রভৃতি।

বাংলাদেশ সরকার নারী উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন এবং এই প্রসংগে মহিলা পরিষদের নেত্রীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তারা নারী উন্নয়নের পরিকল্পনা সম্পর্কে আশাবাদী কি না। দেখা গেছে, সকলেই নারী উন্নয়ন সম্পর্কে আশাবাদী। নেত্রীগণ মনে করেন যে উন্নয়ন একটি সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের নারীসমাজের উন্নতি হচ্ছে এবং ক্রমেই আরও উন্নতি হবে। তবে তাদের ধারণা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময় সরকার পরিকল্পনা ঘোষণা করলেও সেগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পদক্ষেপ গৃহীত হয় নি। পরিষদের নেত্রীগনেণর অধিকাংশের বক্তব্য হলো নারীমুক্তির জন্য প্রয়োজন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন। বৃহত্তর নারী সমাজকে প্রগতি বিরোধী শক্তিগুলোর মুলোৎপাটন করতে হবে। সামাজিক কাঠামো যদি পরিবর্তত না হয় তাহলে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত ঐ সকল পরিকল্পনা কখনো সম্পূর্ণ ও সার্বিকভাবে ব বাস্তবায়িত হবে না।

উপসংহার

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের নেত্রীদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি সম্পর্কে জানতে গিয়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্যাদের উপর জরিপ চালিয়ে যা প্রমানিত হয় তা হলো বাংলাদেশের আর্থিক, শিক্ষাগত ও সামাজিক অবস্থানগত দিক থেকে দেশের সাধারণ নারী সমাজের সংগে তাঁদের ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। সমাজের সকল স্তরের নারীগণ এই পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করেন না। এটা প্রমানিত হয় যে সংগঠনটির প্রত্যেক স্তরে অর্থাৎ জেলা, উপজেলা পর্যায়ে কতিপয় নারী সংগঠনটির সার্বিক পরিকল্পনা দায়িত্বে নিয়োজিত এবং তারাই নেত্রী হিসেবে চিহ্নিত। তবে সংগঠনের সার্থকতার জন্য সমাজের সকল স্তরের জনগণের প্রতিনিধিত্ব একান্তভাবে প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই প্রায় নারী। এটা স্পষ্টই পরিস্ফুটিত হয়েছে যে দেশের সামগ্রিক উন্নতি করতে হলে এ দেশের নারীসমাজের উন্নয়ন অপরিহার্য। এ জন্য সরকার বিভিন্ন নারী উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়েছেন কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক কারনে সেগুলোর সব বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় নি। মহিলা পরিষদের নেত্রীদের বক্তব্য হলো এসব অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন করতে হবে। সত্যিকার অর্থে নারী উন্নয়ন করতে হলে এ দেশের নারীসমাজকে সামাজিকভাবে গতিশীল ও রাজনৈতিক দিক থেকে সজাগ করে তোলাই সর্বাগ্রে আবশ্যক।

তথ্য নির্দেশিকা:

১. নেতৃত্বের বিস্তারিত বিশ্লেষনের জন্য দেখুন, C. I. Barnard, Organization and Management, p. 83. এবং Henry G. Hodges, Management: Principles, Practices and Problems (Boston: Houghton Mifflin Co. 1955), p. 68.

২. Choudhury and Ahmed, Female Status in Bangladesh p. 150.

৩. এ অধ্যায়ের জন্য উপাত্ত দুভাগে সংগৃহীত হয়েছে। বিশেষ তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রণীত প্রশ্নমালা অধিকাংশ নেত্রীগণ পূরণ করেছেন। এছাড়া, তাঁদের সাক্ষাৎকারও নেওয়া হয়েছে।

M. Rashiduzzaman, Politics and Administration in Councils: A Study of Union and District Councils in East Pakistan (Dhaka: Oxford University Press, 1968), p. 13.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

নারী উন্নয়নে মহিলা পরিষদের ভূমিকা

১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে মহিলা পরিষদ আত্মপ্রকাশ করার পর থেকে দেশের সর্বস্তরের নারীদের বিবিধ সমস্যা সমাধানকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং করছে। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছি বিভিন্ন লক্ষ্য যেমন নারীমুক্তি কাফেম, নারী আন্দোলন, সনাতন আইনের পরিবর্তন প্রভৃতি উদ্দেশ্য সামনে রেখে মহিলা পরিষদ গঠিত হয়। মূলদাবী হিসেবে মহিলা পরিষদের লক্ষ্য হল বাংলাদেশের নারী সমাজের পূর্ণ মুক্তি অর্জন ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, আইনগত, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করে সর্বত্র নারী সমাজের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং সকল প্রকার নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে দেশের নারী সমাজকে মুক্ত করাই হচ্ছে মহিলা পরিষদের সার্বিক লক্ষ্য। নারী অধিকার সংরক্ষণ বিভিন্ন দাবী আদায়ের লক্ষ্যে জন্মলগ্ন থেকে মহিলা পরিষদ বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে তুলেছে এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে সার্থকতা অর্জন করেছে। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের নারী সমাজের অধিকার আদায়ের জন্য মহিলা পরিষদ বিশেষ অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে। তবে মহিলা পরিষদ কোন কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে নারী নির্যাতন, নারী হত্যা, ধর্ষন, পাচার, এবং যৌতুকের জন্য নারীদের উপর নানা প্রকার নিপীড়ন এমনকি হত্যা পর্যন্ত ঘটে চলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নারী হত্যা, নির্যাতন, যৌতুক, ধর্ষন ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন, পাচারকৃত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

382777

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েদের ফিরিয়ে আনা ও নির্যাতিত মেয়েদের পুর্নবাসনসহ আইনগত সাহায্য প্রদান, প্রচলিত নারী স্বার্থ বিরোধী আইন সংশোধন করে তাদের জন্য সুখী সুন্দর জীবন যাপনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধির দাবীতে মহিলা পরিষদ জোর আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এই অধ্যায়ে মুলতঃ মহিলা পরিষদের ভূমিকা আলোচনা করা হবে। আলোচনার সুবিধার জন্য মহিলা পরিষদের ভূমিকাকে তিনভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা যায়। এগুলো হল (১) সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে (২) অর্থনৈতিক দাবী পুরনের ক্ষেত্রে এবং (৩) রাজনৈতিক অধিকার ও সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মহিলা পরিষদের ভূমিকা।

সামাজিক ক্ষেত্রেঃ

সামাজিক ক্ষেত্রে মহিলা পরিষদ প্রধানতঃ নারী হত্যা ও নির্যাতন বন্ধ, বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ রোধ এবং যৌতুক ও পণ প্রথা নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে মহিলা পরিষদ বিভিন্ন সময়ে নারী নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে আন্দোলন করেছে এবং সরকারের কাছে দাবী পেশ করেছে। এ সকল আন্দোলন ধীরে ধীরে চরম রুপ ধারণ করে এবং এর অভিব্যক্তি ঘটে ১৯৮০ সালে। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ময়মনসিংহ সমাবেশে মেয়েদের প্রতি অসম্মান, হত্যা, তালাক, বহুবিবাহ, যৌতুক প্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও আইন প্রণয়নের দাবী জানানো হয়।[১] ঐ একই বছর জুন মাসে যৌতুকের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী মিছিল করা হয়। ১৯৮০ সালে যৌতুক, নারী হত্যা, ধর্ষণ, ইত্যাদি বন্ধ করার জন্য সরকারীভাবে কার্যকরী আইন প্রণয়নের দাবী জানিয়ে মহিলা পরিষদ এককভাবে

Dhaka University Institutional Repository

বিশ হাজার মহিলা স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি মহিলা মন্ত্রনালয়ে পেশ করে। হাজার হাজার মহিলাদের প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে সংসদ সদস্যের কাছে এবং তৎকালীন স্পীকারের কাছে মহিলা পরিষদ দাবীনামা পেশ করে।[২] এই প্রেক্ষিতে পাশ হয় ১৯৮০ সালের যৌতুক বিরোধী আইন।[৩] এর ঠিক তিন বছর পর ১৯৮৩ সালে পাশ হয় নারী নির্যাতন নিবর্তনমূলক আইন। নারী নির্যাতন নিবর্তনমূলক অধ্যাদেশের ধারাগুলো বিশ্লেষণ করলে ৬ প্রকার অপরাধীর শাস্তির বিধান পাওয়া যায়। এগুলো হল:

১. "দেহ ব্যবসায়ে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে অথবা কোন বেআইনী বা অসৎ উদ্দেশ্যে বা কোন নারীকে উপরোক্ত বৃত্তিতে নিয়োগ করা হবে জেনে অথবা কোন নারীকে তার ইচ্ছার বা মতের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে অথবা কোন নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করতে বাধ্য করা হবে জেনে অথবা কোন নারীকে যৌন সহবাসে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা হতে পারে অথবা তাকে যৌন সহবাসে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করা হবে জেনে কোন ব্যক্তি যে কোন বয়সের নারীকে অপহরণ করলে, তার শাস্তি যাবজীবন কারাদন্ড অথবা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং জরিমানা।"

২. "কোন নারীকে দেহ ব্যবসায়ে নিয়োগ করার বা পতিতা হিসেবে ব্যবহার করা বা কোন লোকের সংগে যৌন সহবাসের বা যে কোন বেআইনী বা অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের নিমিত্তে বা এইরূপ বে আইনী বা অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে জেনে কোন ব্যক্তি কোন নারীকে আমদানী, রফতানী বা ক্রয় বিক্রয় করে

Dhaka University Institutional Repository

বা তাড়া দেয় অথবা হস্তানুর করে বা অন্য কোন ভাবে যে কোন বয়সের নারীকে সংগ্রহ করে তবে তার শাস্তি যাবৎজীবন কারাদন্ড অথবা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং জরিমানা।"

৩. "যৌতুক আদায়ের উদ্দেশ্যে মৃত্যু ইত্যাদি ঘটলে শাস্তি নিম্নরূপ হবে: স্বামী বা তার পিতা মাতা বা অভিভাবক বা আত্মীয় স্বজন যৌতুক আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন নারীর মৃত্যু ঘটালে বা ঘটানোর চেষ্টা করলে বা গুরুতর আঘাত করলে তার শাস্তি যাবজীবন কারাদন্ড অথবা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং জরিমানা।"

৪. "যে ব্যক্তি নারী ধর্ষণ করে অথবা নারী ধর্ষনের চেষ্টা করে এবং তার ফলে সেই নারীর মৃত্যু ঘটে অথবা ধর্ষনের পর হত্যা করে, তবে তার শাস্তি যাবজীবন কারাদন্ড অথবা চৌদ্দ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং জরিমানা।"

৫. "যে কোন ব্যক্তি নারী ধর্ষনের নিমিত্তে অথবা নারী ধর্ষনের চেষ্টায় মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করে বা গুরুতর আঘাত করে তবে তার শাস্তি যাবজীবন কারাদন্ড অথবা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং জরিমানা।"

৬. "কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীনে উপরোক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধে সাহায্য করলে তারও উক্ত অপরাধীর শাস্তি অনুরূপ হবে।"[৪]

যদিও বাংলাদেশ সরকার "নারী নির্যাতন-নিবর্তনমূলক শাস্তি অধ্যাদেশ ১৯৮৩" জারি করেছেন তথাপিও এই অধ্যাদেশ বাস্তবায়িত হওয়া খুব কঠিন কারণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমতঃ আইন থাকলেও গরীব ও সাধারণ মেয়েরা এই আইনের সুযোগ ভোগ করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এই আইনের ধারা উপধারাগুলোর মধ্যে ফাঁক রয়েছে। "উপহারস্বরূপ মেয়েকে কিছু দেয়া যৌতুক হবে না।" এবং "বিয়ের সময় কিছু চাওয়াকেই যৌতুক বলা হবে" — এই দুটি ধারা যৌতুক বিরোধী আইনে ফাঁক সৃষ্টি করছে। এরই দরুণ যৌতুক বিরোধী আইনের সাহায্যে প্রথম মামলাকারী জহুরা বেগম সমস্ত নির্যাতন ভোগ করা সত্ত্বেও মামলায় হেরে যান এবং তার ডাক্তার স্বামীর কোন শাস্তি হয় নি। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে মহিলা পরিষদ আবারও আন্দোলন সংগঠিত করে। ১৯৮৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মহিলা পরিষদের পক্ষ থেকে ২০ দফা দাবী সনদ তুলে ধরা হয়।[৫] এই দাবীগুলো হল:

(১) নারী হত্যাকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা যেন বাস্তবায়িত হয় সেজন্য সরকারীভাবে সকল মহিলা সংগঠনের জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হোক। এই কমিটি সামগ্রিক ভাবে দেশের সর্বত্র নারী হত্যা ও নির্যাতনের বিষয়টি জরিপ করবে এবং প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ নেবে। এজন্য উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে এই কমিটি বা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি করে শাখা খোলা দরকার এবং ঐ সকল শাখায় মহিলা সংগঠক ও সমাজসেবী ও সরকারী অফিসার থাকবেন। তারা যখনই একটি ঘটনা ঘটনার সংবাদ পাবেন তখনই সরজমিনে তা দেখতে যাবেন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। এর ফলে দরিদ্র ও অসহায় মহিলাদের প্রতিরোধ শক্তি বাড়বে। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে উঠবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) প্রচলিত নিয়মে বিভিন্ন সরকারী কেসে যেমন সরকারী প্রসিকিউটার থাকেন তেমনি নারী নির্যাতন বিষয়ক কোন কেসে সরকারী উকিল নিয়োগের ব্যবস্থা সরকার থেকে করা দরকার। তাতে দুঃস্থ, নির্যাতিত মহিলারা তাঁদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকারার্থে আইনের সাহায্য নিতে এগিয়ে আসবেন।

(৩) অস্বাভাবিক ও সন্দেহ জনক নারী হত্যার কেস দ্রুত পুলিশ রেকর্ডভুক্ত করা দরকার এবং দোষী ব্যক্তিকে তৎক্ষনাৎ গ্রেফতার করা দরকার। মৃত বা নিহত নারীর বিষয়ে রিপোর্ট সাথে সাথে করা দরকার।

(৪) আত্মহত্যার আইন সংশোধিত হওয়া দরকার। আত্মহত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিকে অবশ্যই সনাক্ত করে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) হত্যা, আত্মহত্যার ফলে মৃত্যু হলে এসব কেসের তদন্ত কাজ অবশ্যই একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহিলা পুলিশ অফিসারের দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। মহিলা সংগঠন বা সমাজ কর্মীরা নারী পুরুষ যেই হোক না কেন যারা এই ধরনের কেসের পক্ষের লোক তাদেরকে এই তদন্তের সময় যুক্ত করতে হবে। যদি নিহত মহিলার অভিভাবক তদন্ত কাজে অসন্তুষ্ট হন তবে তা সি,আই,ডি, তদন্তের জন্য পাঠাতে হবে। ইনভেষ্টিগেটিভ মেশিনারী বা অনুসন্ধান পদ্ধতির সংস্কার করা আবশ্যক। মহিলা সংগঠনগুলোকে সক্রিয়ভাবে এই ধরনের তদন্ত কাজে যুক্ত থাকতে দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) কোন গৃহবধুর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে অবশ্যই হত্যা বলে ধরে তদন্ত করতে হবে। নারী হত্যার কেসে বা মৃত্যু কেসে অবশ্যই ময়নাতদন্ত করতে হবে। হত্যা কেসে যদি কোন প্রত্যক্ষদর্শী না পাওয়া যায় (পরিবারের লোকজন ছাড়া) তবে পরিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে প্রমান সংগ্রহ করতে হবে।

(৭) ধর্ষনের কেসে মেয়েটিকে তাৎক্ষনিক মেডিকেল পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হবে, দোষী ব্যক্তিকে অবশ্যই আটক করতে হবে।

(৮) ধর্ষন বা অন্যান্য সামাজিক নির্যাতনের শিকার যে মেয়েটি হয় তার পক্ষে কোন কেস চালাবার জন্য ফ্রি লিগ্যাল এইড এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৯) মেয়েদের থানায় আনা পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। মহিলাদের কেসে মহিলা পুলিশ নিয়োগ করতে হবে।

(১০) রাজধানীসহ বিভিন্ন শহরে, উপজেলা ও ইউনিয়নে নারী সদস্য বা আশ্রয় কেন্দ্র অবশ্যই তৈরী করতে হবে। নির্যাতিত মেয়েকে তৎক্ষনাৎ আশ্রয় দানের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন।

(১১) সকল ধরনের সামাজিক নির্যাতনের শিকার মেয়েদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১২) পারিবারিক ঝগড়া বিবাদ ও অন্যান্য সমস্যা দুর করার জন্য ফেমিলি কোর্ট অবশ্যই চালু করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(১৩) নারী পাচার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে। নারী পাচার সংক্রান্ত অভিযোগগুলো পুরোপুরি তদন্ত হওয়া দরকার ও কঠোর শাস্তির বিধান হওয়া দরকার।

(১৪) তালাক আইন এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যেন স্বামী বা স্ত্রী উভয়েই কোর্টের রায় ছাড়া তালাক না দিতে পারে।

(১৫) যৌতুক আইন কড়াকড়িভাবে চালু করতে হবে। যৌতুকের কেসে অপরাধীকে জামিন দেয়া যাবে না। আইন ভংগকারীকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

(১৬) সম্পত্তিতে ছেলে মেয়ে উভয়ের সমান অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে আইন করতে হবে।

(১৭) পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে যেমন ব্যাপক প্রচার চলছে তেমনি গুরুত্ব দিয়ে টেলিভিশন, রেডিও ও কাগজে নারী হত্যা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রচার গড়ে তোলা দরকার। মেয়েদের অধিকার ও সুযোগগুলি প্রত্যক্ষ প্রচার করা দরকার। তালাক, যৌতুক ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা বিষয়ে ডকুমেন্টারী ফিল্ম করা দরকার। টিভিতে স্লাইড দেখানো দরকার।

(১৮) কুরুচিপূর্ণ ছবির বই প্রকাশনা এবং বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে এবং এই ধরনের প্রকাশক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

(১৯) নারী জাতির মর্যাদা রক্ষার্থে সামাজিক মনোভাব জাগ্রত করার লক্ষ্যে স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তকে উপযুক্ত গল্প, প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় বা অন্য যে কোন ওয়াজ-মাহফিল, সভা-সমিতির নারী বিদ্বেষী ও কুৎসিত প্রচারনা আইনতঃদন্ডনীয় করতে হবে।

(২০) নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারী সমাজ যেন তাৎক্ষনিক প্রতিবাদে সোচ্চার হতে পারে সেরূপ সুযোগ ও মাধ্যম অবিলম্বে প্রদান করতে হবে।

উপরিউক্ত দাবীগুলো মহিলা পরিষদ সংগঠিতভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারকে গোচরীভূত করেছে। এই দাবিগুলো ১৯৮৩ সালের সাংবাদিক সম্মেলনের পূর্বে বহুবার পরিষদের কর্মকর্তাগণ বিক্ষিপ্তভাবে পেশ করেন। কিন্তু তা ফলপ্রসু না হওয়ায় সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে পরিষদ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষনের চেষ্টা করে কিন্তু সরকার পরিষদের ২০টি দাবি পুরণ করে ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশ সংশোধনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তাই মহিলা পরিষদ এ ব্যাপারে এখনও আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশে বহুবিবাহ নিরোধ কল্পেও মহিলা পরিষদ আন্দোলন চালিয়েছে। ১৯৭৫ সালে মহিলা পরিষদ জাতীয় সম্মেলনে আইনের মাধ্যমে বহুবিবাহ প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য জোরাল বক্তব্য রাখে। জাতীয় সংসদে এই দাবীর প্রেক্ষিত সংসদ সদস্যা মিসেস ফরিদা রহমান মেয়েদের বিয়ের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর ধার্য করার দাবী জানান।[৬] পরবর্তী পর্যায়ে মহিলা পরিষদ ১৯৭৯ সালে দাবী জানায় যে পারিবারিক আদালত গঠন করতে হবে এবং ঐ সমস্ত আদালতে মহিলা বিচারপতি থাকবেন।[৭] বলা যেতে পারে যে এই সকল দাবীনামার প্রেক্ষিতে ১৯৮৫ সালে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ পাশ হয়। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী তালাক রেজিষ্টার্ড হওয়া আবশ্যক। এই অধ্যাদেশে পারিবারিক আদালতের কাঠামো বর্ণনা

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়। বলা হয় এরূপ আদালতে সকল প্রকার মামলা দায়েরের কোর্ট ফি ২৫ টাকা। তাছাড়া, ১৯৮৫ সালের মুসলিম আইনের ১৮ নং অধ্যাদেশে ১৯৬১ সালের পারিবারিক অধ্যাদেশের কিছু ধারা সংশোধিত হয়। এই সংশোধন অনুসারে কোন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে সেই স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পর পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করতে চায় তবে অন্য কোন ব্যক্তির সাথে অনুবর্তী বিবাহ ও বিচ্ছেদ ছাড়াই পুনরায় বিয়ে করতে পারে। এভাবে দুই বারের বেশী বিয়ে আইনত স্বীকৃত হবে না। বিবাহ বিচ্ছেদের পর সন্তানের অভিভাবকত্ব অধিকারের ক্ষেত্রে মেয়ে সন্তান ১৮ বছর পর্যন্ত এবং ছেলে সন্তান সাত বছর পর্যন্ত মায়ের কাছে আইনত থাকতে পারে।[৫]

১৯৮৭ সালে মহিলা পরিষদ আরও কয়েকটি সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করে। এগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখযোগ্য :

১. "১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের সংশোধন করতে হবে। বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে পেশ করা হলে তিনি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ থেকে ২ জন প্রতিনিধি নিয়োগ করে সালিসী পরিষদ গঠন করবেন এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।"

২. "১৯৭৪ সালে মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যেন তালাকের দরখাস্ত দাখিলের সময়ে কমপক্ষে দেনমোহর অর্ধেক টাকা জমা দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সালিসী পরিষদের মতামত ও পক্ষদ্বয়ের মতামত সাপেক্ষ তালাকের চূড়ান্ত নীতি গ্রহণ করতে হবে।"

Dhaka University Institutional Repository

৩. "উত্তরাধিকার আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা নিম্নলিখিতভাবে সংশোধন করতে হবে।

ক) পুত্র সন্তান না থাকলেও কন্যা সন্তান পিতা/মাতার একমাত্র উত্তরাধিকারী হবে।

খ) জাতিধর্ম নির্বিশেষে পিতা মাতা ছেলে মেয়ে স্বামী স্ত্রী প্রত্যেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তিতে সমান অংশ পাবে।"

৪. "১৯৬১ সালের মুসলিম পরিবার আইন অধ্যাদেশ (পরিবর্তন,পরিবর্ধিত) এর ৬ নং ধারার ৫ নং উপধারার 'ক' বিধানটি সংশোধন করে বহু বিবাহ বা দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রে প্রথমা স্ত্রীদের মোহরানার সম্পূর্ণ পরিশোধ এবং নব বিবাহিতাকে একই সংগে মোহরানা পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে এবং একই উপধারার 'খ' বিধানেরও পরিবর্তন করে জেল জরিমানাসহ ন্যূনপক্ষে দুই বছর কারাদন্ড অথবা দুই বছর সশ্রম কারাদন্ড বিধান প্রণয়ন করতে হবে।"

৫. "বিবাহ বিচ্ছেদের সময় দেনমোহরের টাকা প্রদানের ক্ষেত্রে কাবিননামায় উল্লেখিত টাকা বিয়ের সময় থেকে বিচ্ছেদের সময় কালের যে ব্যবধানের ফলে টাকার মূল্যমান যেভাবে বৃদ্ধি পায় সেই হারে দেনমোহরের টাকা ধার্য করতে হবে।

৬. "প্রচলিত অভিভাবকত্ব আইনে পিতাকে স্বাভাবিক অভিভাবক হিসাবে যেভাবে মূল্যায়ন করা হয় তা পরিবর্তন করে মাতাকে অনুরূপ মর্যাদা প্রদান করার আইন করতে হবে।"

৭. "পতিতাবৃত্তি সংক্রান্ত আইনের পূর্নাংগ সংস্কার প্রয়োজন। এফিডেভিট পদ্ধতিতে পতিতাবৃত্তিকে আইন সিদ্ধ করার বিধান বা বিধানসমূহ বাতিল করতে হবে।"

Dhaka University Institutional Repository

৮. "শিশু দত্তক আইন ও শর্তাদি সংশোধন করতে হবে এবং পরিত্যক্ত শিশুদের পুনর্বাসন সহজতর করতে হবে। সামাজিক সচেতনতার জন্য এই আইনের ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতি অর্ডার নং-১২৪ পুনরায় চালু করে শিশু দত্তক ব্যবস্থা চালু করতে হবে।"[৯]

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেবলমাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন আইন পাশের জন্য সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টি করেছে তা নয় বরং মহিলা পরিষদ সুদূর দেশের বিভিন্ন এলাকায় নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলো জানামাত্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং সম্ভবমতঃ নির্যাতিত মেয়েদের পক্ষে দাঁড়িয়ে আইনগত সাহায্য দান করতেও এগিয়ে গিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৮৪ সালের মার্চ মাস থেকে পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইনগত পরামর্শদানের কেন্দ্র খোলা হয়েছে। বর্তমানে সপ্তাহে প্রতিদিন এই কেন্দ্র খোলা থাকে। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আগত সাহায্য প্রার্থীরা যথারীতি ফর্ম পূরণ করে তাদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং এর ভিত্তিতে তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আইনগত পরামর্শ দানের প্রধান কর্মকর্তাদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জানা যায় যে এই ব্যবস্থা চালু করার পর থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত মহিলা পরিষদ ৫০০শত ঘটনার বিষয় নিয়ে পরামর্শ, বাস্তব পদক্ষেপ, আন্দোলনের প্রাথমিক পদক্ষেপ, বিবৃতি, পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মকর্তার নিকট সঠিক বিচারের দাবী ইত্যাদি করেছে। কেন্দ্রীয় কমিটি ছাড়াও ঢাকা শহর, টংগি, দিনাজপুর, ঝিকরগাছা, জামালপুর, পটুয়াখালি, চট্টগ্রাম, বরিশাল, কুষ্টিয়া, নারায়নগঞ্জ, পঞ্চগড়, বোঁদা, কাপাশিয়া, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, রাজশাহী, প্রভৃতি শাখায় নারী নির্যাতনের ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করা হয়।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা পরিষদের আইন সহায়তা কমিটির কাছে এ পর্যন্ত যে সকল নারী নির্যাতনের অভিযোগ এসেছে সেগুলো বিশ্লেষণ করলে অভিযোগগুলোর প্রকৃতির নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায়। (১) ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরাও গ্রামের নিরীহ মেয়েদের উপর নানাভাবে নির্যাতন চালায়। (২) বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা না হওয়া সত্ত্বেও স্বামী স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে সম্মত হয় না। (৩) বিবাহের পর স্ত্রী জানতে পারল যে সে তার স্বামীর সাত নম্বর স্ত্রী। কিন্তু উপায়হীন বলে নির্যাতিত হয়েও সে স্বামীর ঘরে থাকলো। পরে দেড় বছরের শিশু সন্তানসহ স্বামীই স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়। স্ত্রী তালাক চায়, কিন্তু কোন "কাবিন" না থাকায় কারনে স্ত্রী এখন আইনের আশ্রয় নিতে অপারগ। (৪) ১১ বছরের মেয়ে একটি ছেলের প্রেম নিবেদনে সাড়া দেয়নি বলে তার উপর এসিড নিক্ষেপ করা হয়। (৫) স্বামী স্ত্রীর উপর নির্যাতন করে। স্বামী পরস্ত্রীর সংগে অবৈধ মেলামেশা করে। (৬) বিয়ের পর স্বামী ও শাশুড়ী নির্যাতন করে। (৭) স্বামী প্রায়ই অত্যাচার ও মারধোর করে। দুটো বাচ্চা রেখে ছোট বাচ্চাসহ স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে এবং নতুন বউ ঘরে এনেছে। (৮) প্রতারনার মাধ্যমে বিয়ে করেছে। প্রথম স্ত্রী আছে আবার বিয়ে করার সময় তাকে বলেনি। এখন প্রথম স্ত্রীর চাকরীর টাকা দিয়ে নতুন বউকে নিয়ে সংসার করে। মাস শেষ হলে টাকার খোঁজে প্রথম স্ত্রীর কাছে আসে। এছাড়া প্রথম স্ত্রীর কোন খোঁজ খবর নেয় না। প্রথম বিয়েটা কাবিন ছাড়া হয়েছে। (৯) বিয়ের সময় যৌতুকের কোন কথা ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে যৌতুক দেয়ার পরেও নির্যাতন করে। এখন স্বামী স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। তবুও স্ত্রীকে চাকরী করতে বাধা দেয় এবং নানাভাবে হুমকি প্রদর্শন করে।[১১] আইন সহায়তা কমিটির একজন উপদেষ্টা একটি জরিপে দেখিয়েছেন কোন্ ধরনের

Dhaka University Institutional Repository

সাহায্য প্রার্থীর সংখ্যা কিরকম —

১. নির্যাতিত গৃহবধূ যাঁরা স্বামীর নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে চায়। তাঁরা বিবাহ বিচ্ছেদ চায়না বরং শান্তিপূর্ণভাবে সংসার করতে চায় — এরকম আবেদনই বেশী।

২. স্বামীর নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য বিচ্ছেদ চায় — অল্প সংখ্যক।

৩. অভাবের হাত থেকে বাঁচার জন্য বিচ্ছেদ চায় - নগন্য সংখ্যক।

৪. মেয়েকে হত্যা করায় আত্মীয় পরিজন বিচার চায় — অধিকাংশই।

৫. নিহত ধর্ষিতা নির্যাতিতা পরিচারিকা - যদিও এই নির্যাতনের সংখ্যা অধিক কিন্তু অভিযোগ কম।

৬. পুলিশ ও সরকারী কর্মকর্তা ও অন্য ব্যক্তি দ্বারা ধর্ষনের ঘটনা-উল্লেখযোগ্য।

৭. প্রেম বিচ্ছদের ঘটনা, অপহরণ ও এসিড নিক্ষেপ অধিক সংখ্যায় বাড়ছে।

৮. সামাজিক নির্যাতনের শিকার - উল্লেখযোগ্য।

৯. সন্তানের অধিকার দাবী - অধিকাংশ তালাক প্রাপ্ত মহিলা।

১০. তালাকের পরও প্রাক্তন স্বামী বিচ্ছেদপ্রাপ্ত স্ত্রীকে নানাভাবে নাজেহাল করেও হুমকি দেয় — স্বল্প সংখ্যক।

১১. এসিড বা দাহ্যপদার্থ দ্বারা হত্যা — উল্লেখযোগ্য সংখ্যক।

১২. বিদেশে চাকরিরত স্বামী ও তার পরিবার কর্তৃক নির্যাতিত — উল্লেখযোগ্য।

১৩. স্ত্রী হত্যা যৌতুকের কারণে — প্রচুর সংখ্যক।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. খোরপোষ দেয়না, তালাকও দেয়না, নির্যাতন করে মূলত যৌতুকের জন্য — প্রচুর সংখ্যক।

১৫. যৌতুকের জন্য তালাক — প্রচুর সংখ্যক।

১৬. প্রথম স্ত্রী থাকাসত্ত্বেও দ্বিতীয় বিবাহ — ব্যাপক সংখ্যক।

১৭. স্কুল ছাত্রী অপহরণ ও নির্যাতন — উল্লেখযোগ্য।

১৮. ধর্ষণ — উল্লেখযোগ্য।

১৯. ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়ে নির্যাতন — অনেক, কিন্তু পরিষদ এ মামলা গ্রহণ করে না।

২০. নারীকে চাকরীর প্রলোভন দেখিয়ে পতিতা বৃত্তিতে নিয়োগ, স্বামী স্ত্রীকে দিয়ে পতিতাবৃত্তি করাতে চায়, পতিতা নির্যাতন — কিছু সংখ্যক।[১২]

মহিলা পরিষদের আইন বিষয়ক সহায়তা কমিটি সাধারণতঃ প্রত্যেকটি ঘটনাই পুলিশের উর্ধতন কর্মকর্তাদেরকে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, সংশ্লিষ্ট থানার ও,সি,কে, স্থানীয় চেয়ারম্যানসহ সকল সরকারী প্রভাবশালী কর্মকর্তাদেরকে জানায় এবং সুবিচারের জন্য চাপ দেয়, পত্রিকার ঘটনা তুলে জনমত সৃষ্টি করে। প্রয়োজনে সংগঠনের উদ্যোগে প্রতিরোধ আন্দোলন করে। এরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পটুয়াখালিতে যাত্রাদলের নৃত্যশিল্পী মিনতিদাসের ধর্ষনে, পিরোজপুরের আদর্শবাদী শিক্ষয়িত্রী অনুরূপা ভৌমিকের নির্যাতনে, যশোহরের বেনাপুলের রেহেনা পারভীনকে এসিড নিক্ষেপে, ঠাকুর গাঁয়ের অমিলা, ঢাকার মনুবালা, বরিশালের মায়, প্রভৃতি নির্যাতনের ক্ষেত্রে। এ সকল ক্ষেত্রে মহিলা পরিষদ নিজেই মামলা পরিচালনা করেছে।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

নারীমুক্তি আন্দোলনের সামগ্রিক কার্যধারার অন্যতম একটি উপাদান হচ্ছে সমাজ কল্যান মূলক কর্মকান্ড। তাই সামাজিক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নে ও নির্যাতিত মহিলাদের আইন বিষয়ক পরামর্শ ছাড়াও মহিলা পরিষদ বিবিধ ধরনের সমাজ কল্যানমূলক কাজে নিয়োজিত। স্বাধীনতার প্রথম বছরেই অর্থাৎ ১৯৭২ সালে মহিলা পরিষদ দেশের সর্বত্র শিক্ষাকেন্দ্র ও সেলাই স্কুল চালু করে।[১৪] ১৯৮৬ সাল নাগাদ দেশের বিভিন্ন স্থানে মহিলা কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী অব্যাহত রাখার জন্য এবং অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে সারাদেশে অধিক সংখ্যক বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার জন্য সকল শাখা সংগঠনের প্রতি ১৯৮৬ সালে ১২ই আগষ্ট জোর আবেদন জানানো হয়। বর্তমানে সর্বমোট ২১টি বয়স্কা ও শিশু শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ঢাকা শহরের জাফরাবাদ এলাকায় ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সমাজকল্যান বিভাগের উদ্যোগে নির্যাতিত নারীদের আশ্রয় দান, প্রশিক্ষণ দান ও কর্মসংস্থানের জন্য "রোকেয়া সদন" নামে ১৯৮৫ সালের ১৫ই মে থেকে একটি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে।[১৫]

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে:

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বিশ্বাস করে যে নারী মুক্তির অন্যতম শর্ত হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়া। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ বেকার। মহিলা পরিষদ জন্মলগ্ন থেকেই এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আন্দোলন করে আসছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০ সালের জুন মাসে মহিলা পরিষদ পাবলিক সার্ভিসে মহিলাদের নিয়োগের দাবী জানায়।[১৬] ১৯৭৪ সালে সর্বস্তরের উৎপাদন ক্ষেত্রে মহিলাদের নিয়োজিত করার জন্য মহিলা পরিষদ দাবী জানায়।[১৭] ১৯৭৫ সালে মহিলা পরিষদ তার জাতীয় সম্মেলনে সরকারী চাকরীতে মহিলাদের ১০ ভাগ আসন সংরক্ষনের দাবী জানায়। প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়েও মহিলা নিয়োগের কোটা ১০ ভাগে নির্ধারণ করার দাবী জানায়।[১৮] সুদীর্ঘ আন্দোলনের ফলেই বাংলাদেশে সরকারী চাকুরীতে মহিলা আসন সংখ্যা ১০% সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু ১০% সংরক্ষিত আসনই মহিলা বেকার জনগোষ্ঠিকে ব্যাপকভাবে চাকুরীতে নিয়োগের জন্য যথেষ্ঠ নয়। মহিলাদের অধিকহারে কর্মসংস্থানের দাবীতে মহিলা পরিষদ বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন সংগঠিত করেছে। ১৯৮৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর প্রেস ক্লাবে মহিলা পরিষদ ৫০০ মহিলার উপস্থিতিতে এক সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে এবং ঢাকা জেলা প্রশাসকের নিকট কর্মসংস্থানের স্মারকলিপি পেশ করে।[১৯] ১৯৮৭ সালের সেপ্টেম্বরেও কর্মসংস্থানের দাবীতে পরিষদ সমাবেশ করে এবং মন্ত্রিপরিষদের সচিবের নিকট দাবী পেশ করে। অন্যতম দাবী ছিল চাকুরীতে "সাময়িক সরকারী নিষেধাজ্ঞা" তুলে নেয়া, সারাদেশে ব্যাপকভাবে মেয়েদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং সরকারী চাকুরীতে মহিলাদের ১৫% কোটা ঘোষণা করা। উল্লেখ্য বর্তমানে সরকারী চাকুরীতে নন গেজেটেড পদে মহিলাদের ১০% সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ১৫% এ উন্নীত করা হয়েছে। তবে গেজেটেড পদে এই সংখ্যা ১০% রয়েছে।

বাংলাদেশে যে সকল মহিলা বর্তমানে কর্মরত আছেন তাদেরও বহুবিধ সমস্যা আছে। ঐ সকল সমস্যা সমাধান কল্পে মহিলা পরিষদ দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে। কর্মজীবি মহিলাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে আবাস স্থানের। ১৯৭৫ সালে মহিলা পরিষদ চাকুরীজীবি মহিলাদের জন্য একটি মিলনায়তন ও আবাসস্থানের

Dhaka University Institutional Repository

দাবী করে।[২০] এ প্রসংগে উল্লেখ করা যায়, ১৯৭৯ সালেই চট্টগ্রামে কর্মজীবি মহিলাদের জন্য হোষ্টেল তৈরী হয়। ঢাকাতে ১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেলের উদ্বোধন করা হয়।

সরকারী আইনানুযায়ী সরকারী চাকুরীতে স্ত্রী বা স্বামী যদি সরকারী বাড়ীতে থাকেন তবে যার নামে বাড়ী বরাদ্দ থাকে না তিনি বাড়ী ভাড়া থেকে বঞ্চিত হন। মহিলা পরিষদ এই আইন বাতিল করে একজন বাড়ী পেলে অপরজন যাতে বাড়ী ভাড়া ভাতা পান সেই দাবীতে ১৯৮৪ সালে ১৩শত মহিলা স্বাক্ষর সংগ্রহ করে মতিঝিল শাপলা চত্বরে সভা ও মিছিল করে সচিবালয়ে যায়। মহিলা মন্ত্রী, অর্থ সচিব ও সংস্থাপন সচিবের সংগে সাক্ষাৎ করে। মহিলা মন্ত্রি সমর্থন জানা তবে এখন পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান হয় নি।

কর্মজীবি মহিলাদের একটি অন্যতম সমস্যা চাকুরীস্থল বদলি। বিশেষ করে স্বামী এক স্থলে এবং স্ত্রী আরেক স্থলে চাকরী করলে পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয় এবং ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে। এ ক্ষেত্রে সরকারের কাছে বিভিন্ন সময়ে মহিলা পরিষদ দাবী জানায়। ফলে সরকারের অধ্যাদেশ জারী না হলেও নৈতিকভাবে সরকার এই নীতি মেনে চলার আশ্বাস দেয় যে সম্ভবত স্বামী স্ত্রীর কর্মস্থল একই জায়গায় রাখার চেষ্টা করা হবে। ১৯৮৬ সালে একবার ঢাকা শহরের প্রাইমারী স্কুলের বেশ কয়েকজন শিক্ষিকাকে নিয়মবহির্ভূত ভাবে বদলী করা হলে তারা সুবিচারের জন্য মহিলা পরিষদের কাছে প্রতিবেদন জানান। মহিলা পরিষদ এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট তাদের বদলীর আদেশ বাতিল করার দাবী জানায় এবং পরবর্তীতে বদলীর আদেশ বাতিল হয়।[২১]

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবি মহিলাদের অন্যতম সমস্যা হল মেয়েদের জন্য পর্যাপ্ত যানবাহনের অভাব। মেয়েদের জন্য নির্ধারিত সীমিত সংখ্যক আসন বহাল থাকলেও ভীড়ের চাপে তাতে উঠা সম্ভব হয় না। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বাসে মহিলাদের সিট ও অধিকসংখ্যক বাস চালু এবং মহিলাদের জন্য সকল রুটে বাস চালুর দাবীতে সভা ও মিছিল করে এবং বাস মালিক সমিতি ও বি,আর,টি,সির চেয়ারম্যানের নিকট বিভিন্ন সময়ে স্মারক লিপি পেশ করেছে। ১৯৭৩ সালে মহিলাদের জন্য পৃথক বাস সার্ভিস দাবী করার প্রেক্ষিতে সরকার মহিলাদের জন্য পৃথক বাস চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[২২] কিন্তু পর্যাপ্ত সংখ্যক বাস মহিলাদের জন্য দেয়া হয় নি। ফলে বাসে ও মিনিবাসে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মহিলা পরিষদ আন্দোলন করে। গত কয়েক বছর ধরে মহিলা পরিষদ দাবী জানায় যে নির্দিষ্ট আসনে যাতে মহিলারা বসতে পারে সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে এবং মহিলা বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রত্যেকটি বাসে মহিলাদের আসন সংখ্যা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং মহিলাদের জন্য ঢাকা শহরে ১২টি বাস চালু রয়েছে।

মহিলা পরিষদ কিছু কিছু পেশাতে সম্পূর্ণ ভাবে মহিলা নিয়োগের দাবী নিয়েও আন্দোলন করেছে যেমন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও নার্সিং পেশায় সম্পূর্ণ ভাবে মহিলা নিয়োগের দাবী জানানো হয়। ১৯৮৬ সালের ১৬ই জুন বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সেবিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পুরুষ প্রশিক্ষনার্থী ভর্তি বিষয়ে নীতি নির্ধারণ প্রশ্নে আলাপ আলোচনার জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।[২৩] উক্ত সভায় স্বাস্থ্য পরিদপ্তর ও সেবা পরিদপ্তরের প্রতিনিধি, বিভিন্ন বড় বড় সরকারী হাসপাতালের পরিচালকবৃন্দ, স্বাস্থ্য সচিব ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে আন্দোলন বিভাগের আহবায়িকা এবং পরিষদের

Dhaka University Institutional Repository

একজন সম্পাদিকা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নীতিগতভাবে মনে করে যে নার্সিং পেশাটি সর্বোতভাবেই মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত কারণ পৃথিবীব্যাপী এটি মহিলাদের পেশা হিসেবে স্বীকৃত। এই পেশার মাধ্যমে ব্যাপক সংখ্যক মহিলার কর্মসংস্থানের সুযোগও রয়েছে। পরিশেষে, এই মতামতটিই সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হয় এবং একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি প্রতি বছর পুরুষ নার্স নিয়োগের ও প্রশিক্ষনদানের সংখ্যা নির্ধারণ করবেন। তিন বছরের জন্য অনুবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে এই ব্যবস্থাটি চালু থাকবে।[২৪] নার্সিং এর ক্ষেত্রে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পরিষদ বিভিন্ন সময় উচ্চ পর্যায়েও যোগাযোগ রক্ষা করেছে। ঐ একই বছর ১৯শে নভেম্বর বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নার্সিং পেশার প্রতি বৈষম্যমূলক সামাজিক দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন এবং এ পেশার অন্যান্য সমস্যা সমাধানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য একটি আন্দোলন সভার আয়োজন করে।

অন্যান্য পেশার মধ্যে সাধারণ ও নিম্ন শ্রেণীর মহিলারা শহরে প্রধানতঃ পোষাক শিল্প এবং গ্রামে ক্ষেত মজুরের কাজ করে থাকেন। ঐ সকল মহিলাদের সমস্যা নিয়েও মহিলা পরিষদ আলোচনা করেছে। ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন কল কারখানায় কিছু কিছু নারী শ্রমিক কাজ করে আসছেন। ক্রমে ক্রমে নারী শ্রমিকের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগে কেবলমাত্র হাসপাতালে, চা বাগানে ও কিছু অফিসে সীমিত সংখ্যক মহিলা কাজ করতেন। বর্তমানে মূলতঃ গার্মেন্স ফ্যাক্টরীতে অধিক সংখ্যক নারী শ্রমিক নিয়োজিত। এছাড়া, বিভিন্ন বস্ত্র কলে, কল-কারখানায়, টেলিফোন, শিল্প সংস্থা সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রি তৈরীর কারখানায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী শ্রমিক কাজ করছেন।[২৫] কিন্তু এই সমস্ত নারী শ্রমিকবৃন্দ সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেও শ্রমের ন্যায্যমূল্য পাননা। এমন কি জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

মর্যাদা ও নিরাপত্তাও তারা পান না। নারী শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী দেয়া হয় না। চাকুরীতে পান না নিয়োগ পত্র। যার ফলে তারা যখন তখন ছাটাই হতে পারেন। বাধ্যতামূলক ওভারটাইম করানো হয় কিন্তু সেই কাজের মজুরীর বিষয়ে ওদের কার্ডে লেখা থাকে না। ফলে বাড়তি কাজের মজুরী দেয়া না দেয়া মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। পুরুষ সুপার ভাইজার অশ্লীল আচরণ করে বলেও অভিযোগ থাকে। অনেক সময় মালিকের কুনজরে পড়ে হারাতে হয় সম্মান। পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে বেশী অবহেলিত ও লাঞ্ছিত হয় নারী শ্রমিকরা। প্রায় প্রতিদিন রাত করে বাড়ী ফেরার জন্য পারিবারিক জীবনে আসে সন্দেহ ও অবিশ্বাস। ফলে ভেংগে যাচ্ছে দাম্পত্যজীবন।[২৬] মহিলা পরিষদের উদ্যোগে পোষাক শিল্পের নিয়োজিত ব্যাপক সংখ্যক নারী শ্রমিকের সমস্যা নিয়ে ও তার সমাধানের উপায় অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালের ৩১শে অক্টোবর ঢাকায় একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া মহিলা পরিষদ বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ সমস্যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের সংগে আলাপ করে থাকে যেমন ১৯৮৬ সালে কোন বিশেষ গার্মেন্টস কোম্পানী রাত ১২টা পর্যন্ত মহিলাদের বাধ্যতামূলক ওভারটাইম করানো এবং মধ্যরাতে কাজ শেষ করে অফিস থেকে বের করে দেয়ার প্রতিবাদে বাংলাদেশ মহিলা মন্ত্রনালয়ে ও শ্রম মন্ত্রনালয়ের কাছে প্রতিবাদ লিপি দেয়া হয়।

বাংলাদেশে শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে মহিলারা অনেক ক্ষেত্রে ভিন্নতর জীবন যাপন করছে। পুরুষদের মতো মহিলারাও ক্ষেতে খামারে কাজের সাথে সম্পৃক্ত। তারা প্রধানতঃ পাট ধান নিড়ানী, ধান কাটা এবং পাট ধোয়ার কাজের সাথে জড়িত থাকে। একই ধরনের কাজ করলেও সাধারণতঃ মহিলাদেরকে পুরুষের সমান মজুরী দেয়া হয়না, যেমন, ১৯৮২-৮৩ সালে পুরুষরা দৈনিক মজুরী পেত ১০ টাকা, মহিলারা পেত মাত্র ৪ টাকা। মজুরী ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে মহিলা পরিষদ

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন শুরু করে এবং বিভিন্ন এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে ঘেরাও করে। যেমন মহিলা পরিষদ শংকরপুর ইউনিয়নের ১০টা গ্রামে মহিলা শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে মহিলা ক্ষেত মজুর সমিতি ও ব্যাংক সমিতি গড়ে তোলে। এই উভয় সমিতির সংগঠকদের সহযোগিতায় শংকরপুর এলাকায় মহিলা ক্ষেত মজুরদের আন্দোলন তীব্র হয়। ফলে আজ মজুরী বৈষম্যই উঠে যায় নি, সেই সংগে গ্রামীন রক্ষনশীল মনোভাবাপন্ন লোকেরা ক্ষেতমজুর মেয়েদের ও তাদের শ্রমের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাত তার বিরুদ্ধে মেয়েরা প্রতিবাদ করতে সক্ষম হয়েছে। এলাকায় কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী লোক মহিলাদের কাজে যেতে বাধা দিতে চেষ্টা করে বলে যে মেয়েদের বাইরে যাওয়া নাজায়েজ (ধর্মবিগর্হিত)। বাইরে এসে সমিতি করার কারনেই খোদা অসন্তুষ্ট এবং এর ফলেই সময়মত বৃষ্টি হয় না। কিন্তু প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের এ ধরনের বাধা অতিক্রম করেও বর্তমানে মেয়েরা দলবদ্ধভাবে মাঠে কাজ করছে।[২৭]

বাংলাদেশে পতিতাবৃত্তি বন্ধ করার লক্ষ্যেও মহিলা পরিষদ ভূমিকা পালন করেছে। নারী ব্যবসা ও পতিতাবৃত্তির মূলোৎপাটন ও নির্যাতিত এই মেয়েদের প্রকৃত পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে ১৯৮৫ সালে ১৯শে মে ঢাকায় সর্বস্তরের নারী-পুরুষের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা পতিতা সমস্যা সমাধানের জন্য দুঃস্থ মেয়েদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ব্যবস্থা গ্রহণ ও শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ঐ সভায় নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করা হয়, যথা—

১. কাজের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে বহু মেয়ে নারী ব্যবসায়ী দালালদের চক্রান্তে পতিত হয়। মহিলা পরিষদ বিশ্বাস করে যে যদি গ্রামে/শহরে সরকারী ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক কর্মকেন্দ্র ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে দুঃস্থ মেয়েরা নারী ব্যবসায়ী দালালদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

২. উচ্ছেদকৃত পতিতাদের অগ্রাধিকার ও যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকুরী প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. পরিচারিকার কাজ সরকারী শ্রম আইনের আওতাভুক্ত করতে হবে।

৪. পতিতাবৃত্তি নিরুতকল্পে নারী নির্যাতন অধ্যাদেশের ফাঁক দুর করতে হবে। এই আইনে বলা হয়েছে যে কোন নোটারী পাবলিক যদি সত্যায়ন করে যে কোন মেয়ে স্বেচ্ছায় পতিতা হয়েছে তাহলে দালালের শাস্তি হবে না। নোটারী পাবলিকের এরূপ সার্টিফিকেট দালালরা মায়েদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে বা জোর করে খুব সহজেই আদায় করতে পারে। তাই মহিলা পরিষদ উক্ত আইনের এই ফাঁক সংশোধন করে কার্যকর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দাবী জানায়।[২৮]

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে মহিলাদের সাহায্যের জন্য মহিলা সংগঠনগুলোর দাবীর প্রেক্ষিতে ১৯৭৬ সালে সরকার বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা গঠন করে। এর চার মাস পরেই নারী বিষয়ক মন্ত্রনালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। ১৯৭৭ সালে সরকার মহিলা বিষয়ক একটি পরিষদ গঠন করে। ১৯৭৮ সালের ৭ই আগষ্ট মন্ত্রিপরিষদ মহিলাদের কল্যানে সরকারকে পরামর্শ দেয়ার জন্য একটি জাতীয় মহিলা কল্যান সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। এই সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান মহিলা শক্তিকে উপযুক্তভাবে ব্যবহারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। যেমন সংস্থার পরিদপ্তরে একটি সেল খোলা হয়েছে যেখানে মেয়েদের নিজেদের সমস্যাসম্পর্কিত নানারূপ অভিযোগ পেশ করতে পারে। চাকুরী বিনিয়োগ তথ্য কেন্দ্রও স্থাপন করা হয়েছে। এই সংস্থা সামাজিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছে। শিক্ষা বিভাগে মেয়েদের বৃত্তি, প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকের জন্য ট্রেনিং, জেলাগুলোতে মহিলা কলেজ প্রভৃতির ব্যবস্থা করেছে। এই সংস্থা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রনালয়ের সহায়তায় মেয়েদের সমবায় সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক জেলায় বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং পরিদপুরে বিক্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে।[২৯] মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয় ও মহিলা পরিদপুরের নারী উন্নয়নকল্পে এ সকল কার্যকলাপ নারী সংগঠনগুলোর চাপের ফলেই সম্ভব হয়েছে। মহিলা পরিষদের মত সকল নারী চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ফলশ্রুতিই হচ্ছে মহিলা মন্ত্রনালয়ের কর্ম প্রচেষ্টা।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে:

এটা সর্বজনবিদিত যে ১৯৬৯ সালের প্রেক্ষাপটেই মহিলা পরিষদের জন্ম হয়। তারপর থেকেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে মহিলা পরিষদ আন্দোলন করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে একাত্মতা ও সংহতি ঘোষণা করে মহিলা পরিষদ নিজ উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেছিল।[৩০] স্বাধীনতার পর মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দাবীনামা এই সংস্থা সরকারের কাছে পেশ করেছে। ১৯৭২ সালে মহিলা পরিষদ ১৯টি জেলা থেকে ১৯টি মহিলা আসন ও ঢাকা শহর থেকে ১টি মোট ২০টি আসন সংরক্ষিত রাখার দাবী জানায়।[৩১] তাছাড়া এই সংগঠন মহিলা আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনও দাবী করে। পরিষদ দেশের সংবিধানে মহিলাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, ও অর্থনৈতিক অধিকার সুনির্দিষ্ট রাখার দাবী জানায়। যখন সংবিধানে সংবিধান কার্যকরী হওয়ার পর থেকে ১০ বছরের জন্য মহিলাদের আসন সংখ্যা জাতীয় সংসদে ১৫টি নির্ধারণ করা হয় তখন থেকেই মহিলা পরিষদ মহিলাদের আসন সংখ্যা আরো বৃদ্ধির দাবী জানায়। পরবর্তীকালে ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদে ১৫টি সংরক্ষিত আসনের পরিবর্তে ৩০টি

Dhaka University Institutional Repository

আসন সংরক্ষিত রাখার বিধান করা হয়েছিল এবং সময়সীমা ১০ বছর থেকে ১৫ বছর করা হয়েছিল। বলাবাহুল্য সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সময়সীমা ১৯৮৭ সালে অতিক্রান্ত হয়েছে। পরবর্তীতে মহিলাপরিষদ ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের দাবীও পেশ করেছিল এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে ২টি মহিলা আসন সংরক্ষনের বিধান চালু হয়।

মহিলাদের জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের দাবী ছাড়াও মহিলা পরিষদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দাবীর প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। দেশে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েমের জন্য বিভিন্ন সময় দাবী নামা পেশ করেছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রনের বিরুদ্ধেও এই সংগঠন প্রতিবাদ জানিয়েছে। প্রগতিশীল রাজনৈতিক জোটের ঘোষিত ২১ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যও গণ আন্দোলন গড়ার জন্য আহুত সকল গণ সমাবেশে মহিলা পরিষদ যোগদান করেছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে সংবিধানের নতুন সংশোধনী ও মহিলা আসনের নির্বাচন পদ্ধতি সংশোধনের দাবী জানিয়েছে।

১৯৮৩ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ও সকল রাষ্ট্রের কাছে প্রদত্ত নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরন সনদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করে মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি দেশের নারীসমাজের মধ্যে এই বিষয়ে সচেতনতা গড়ার জন্য কর্মসূচী গ্রহনের আহবান জানায়। জাতিসংঘের সনদটি ইংরেজী ভাষায় রচিত ছিল। সেটি সর্বস্তরের নারী সমাজ ও জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করা হয়। ১৯৮৬ সালের ১৩ই নভেম্বর বাংলাদেশের ১০টি জাতীয় মহিলা সংগঠনের এক প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভানেত্রী কবি সুফিয়া কামালের সভানেতৃত্বে সভায় জাতিসংঘ প্রনীত নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত দলিলের বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের

Dhaka University Institutional Repository

সহ-সভানেত্রী বলেন যে ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশের নারী সংগঠনগুলোর উদ্যোগে দেশব্যাপী স্বাক্ষর সংগ্রহ করে[৩২] এই আন্দোলন গড়ে তোলা হয় যে জাতিসংঘের উক্ত সনদে বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। অবশেষে ১৯৮৪ সালের আগষ্ট মাসে সনদের কয়েকটি ধারা বাদ দিয়ে আংশিক স্বীকৃতি জানানো হয়। সরকারের এই স্বীকৃতির পেছনে পরিষদের জনমতসৃষ্টিমূলক চাপ প্রয়োগ কার্যকরী হয়েছিল বলে মনে করা হয়। মহিলা পরিষদ বাংলাদেশ সরকারকে আরও সুপারিশ করেছে যে জাতিসংঘে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মহিলা মন্ত্রনালয় যে রিপোর্ট প্রদান করবেন, সেই রিপোর্ট প্রণয়নের পূর্বে ও পরে দলমত নির্বিশেষে সমগ্র নারী সমাজের প্রতিনিধিদের সংগে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে।

রাজনৈতিকভাবে মহিলাদেরকে সচেতন করার জন্য মহিলা পরিষদ কর্মীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করে থাকে। পূর্বেই বলা হয়েছে এই প্রেক্ষিতে মহিলা পরিষদ একটি প্রশিক্ষন উপ-পরিষদ গঠন করেছে। এই উপ-পরিষদ এই পর্যন্ত চারশতেরও অধিক কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। তাছাড়া মহিলাদের মধ্যে অধিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য মহিলা পরিষদ বিভিন্ন বই বা পুস্তিকা যথা "নারী জাগরণ ও মুক্তি" প্রকাশ করেছে। প্রচার প্রকাশনা উপ-পরিষদ বিভিন্ন সময়ে বুলেটিন পুস্তিকা প্রভৃতি প্রকাশ করে থাকে। এছাড়া নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে "মহিলা সমাচার" নামে সংগঠনের মাসিক মুখপত্র।

অন্যান্য ক্ষেত্রে :

বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন, যখনি দেশে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা প্রভৃতি দেখা দেয় তখনই মহিলা

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদ নিজ উদ্যোগে ত্রান তৎপরতা চালিয়ে থাকে। এভাবেই মহিলা পরিষদ ১৯৭০ এর দুর্যোগ, ১৯৭৪ এর বন্যা, ১৯৮৬র ঘুর্ণিঝড়, ১৯৮৭র বন্যা দুর্গত এলাকায় বিভিন্ন ত্রান তৎপরতা চালিয়েছে। দেশে যখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় তখনই মহিলা পরিষদ সমাবেশ ও প্রতিবাদ সভা সংগঠিত করে। সাম্প্রতিক কালের (১৯৮৭) দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি রোধকল্পেও মহিলা পরিষদ বিভিন্ন সভা, মিছিল করেছিল। সাফ গেমস[৩৩] এ মেয়েদের অংশ গ্রহন নিশ্চিত করার জন্য মহিলা পরিষদ প্রথম থেকেই দাবী জানিয়েছিল ফলে পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৮৭ সালে সাফ গেমসের খেলায় মেয়েদের অংশগ্রহনের সুযোগ দেয়া হয়। বিশ্বের বিভিন্ন মহিলা আন্দোলন ও সংগ্রামরত নারী সমাজের সাথে মহিলা পরিষদ বিভিন্ন সভায় সংহতি প্রকাশ করেছে। যেমন বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত আফ্রিকার নারী সমাজের সাথে সংহতি প্রকাশের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে বিভিন্ন সমস্য আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া পরিষদ আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, আন্তর্জাতিক শিশু দিবস ইত্যাদি উপলক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

উপসংহারঃ

উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ১৯৭০ থেকে ১৯৮৬ এই দীর্ঘ ১৬ বছরে মহিলা পরিষদ বাংলাদেশের নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে আন্দোলন করেছে। এটা সুস্পষ্টই প্রতীয়মান যে বহুমুখী ও বহুবিধ বিস্তৃত কাজের মধ্যে পরিষদ মূলতঃ দুটি মূল কাজ করতে চেষ্টা করেছে। প্রথমতঃ নারীর প্রতি প্রচলিত সমাজের দৃষ্টি ভংগি পরিবর্তন করে পিতৃতান্ত্রিক প্রথা ও মূল্যবোধকে

Dhaka University Institutional Repository

ছিন্ন করতে চেষ্টা করেছে। মানবিক জীবনবোধ ও মূল্যবোধ তৈরীর ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন মুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয়তঃ এদেশের ইতিহাসে নতুন ধারায় নারী আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এই আন্দোলন মানবিক মুক্তি আন্দোলনের মূল ধারার সাথে ধীরে ধীরে সম্পৃক্ত হয়ে ব্যাপকমাত্রা লাভ করছে। দেশের সর্বস্তরের নারী সমাজ এই সকল আন্দোলনে অংশীদার হয়ে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক মুক্তি কামনা করছে। মহিলা পরিষদের চরম সার্থকতা এখানেই যে সমগ্র নারী সমাজকে তাদের বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে আপ্রান প্রয়াস চালিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১. বেগম, ফেব্রুয়ারী ৪, ১৯৭৯।

২. বেগম, আগষ্ট ৩১, ১৯৮০।

৩. "যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০।" বিস্তারিত বিবরনের জন্য দেখুন, চিত্রা ভট্টচার্য, "নারীর আইনগত অধিকার", নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মশালা, ১৯৮৭ (ঢাকা: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ১৯৮৭), পৃঃ ৬৬।

৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, সামিনা খালেক "নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলন ও আইন," মহিলা সমাচার, এপ্রিল ১৯৮৪, পৃঃ ৮।

৫. মহিলা সমাচার, নভেম্বর ১৯৮৩।

৬. বেগম, ফেব্রুয়ারী ১, ১৯৭৫।

৭. বেগম, জানুয়ারী ২৮, ১৯৭৯।

৮. দেখুন চিত্রা ভট্টচার্য, "নারীর আইনগত অধিকার", নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মশালা ১৯৮৭, ঢোকা: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ১৯৮৭), পৃঃ ৬৭।

৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, "মহিলা পরিষদের সুপারিশমালা", নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মশালা, ১৯৮৭, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৭।

১০. সংগঠন বিভাগের সম্পাদিকা আয়েশা খানমের সংগে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

১১. মহিলা সমাচার, জুন ১৯৮৫।

১২. বেলা নবী, "নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও আইন সহায়তা দানে মহিলা পরিষদের কাজ ও অভিজ্ঞতার প্রতিবেদন" নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মশালা, ১৯৮৭, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১-৫৩।

১৩. তদেব।

১৪. বেগম, ১৬ই জুলাই, ১৯৭২।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. মহিলা সমাচার, জুন ১৯৮৫।

১৬. বেগম, ২১শে জুলাই, ১৯৭০।

১৭. বেগম, ৮ই এপ্রিল, ১৯৭৪।

১৮. বেগম, ২রা ফেব্রুয়ারী,১৯৭৫।

১৯. সংবাদ, ২১শে ডিসেম্বর,১৯৮৬।

২০. বেগম, ৩০শে নভেম্বর,১৯৭৫।

২১. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ঢাকা শহর ষষ্ঠ সম্মেলন'৮৭ সাধারণ সম্পাদিকার রিপোর্ট, পৃষ্ঠা-২০।

২২. সংবাদ, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩।

২৩. মহিলা সমাচার, জুন ১৯৮৬, পৃঃ ৭।

২৪. তদেক,

২৫. ১৯৪৭ সালে পোশাক শিল্পের বিকাশ ঘটে, ১৯৬০ সালে ঢাকায় প্রথম পোশাক শিল্পের কারখানা হয়। ১৯৭০ সালে ৫টি, ১৯৮২-৮৬তে ২০০টি, এর মাঝে ৬০টি রপ্তানীকারক কারখানা গড়ে উঠে। ১৯৮৩-৮৪তে ২৫০টি, ১৯৮৫-৮৬তে ৫০০টি পোশাক শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪-৮৫তে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬৭২০০ হাজার নারী শ্রমিক অর্থাৎ ৮০ ভাগ নারী শ্রমিক। বিস্তারিত বিবরনের জন্য দেখুন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা শহর ষষ্ঠ সম্মেলন'৮৭, সাধারণ সম্পাদিকার রিপোর্ট, পৃঃ ৯।

২৬. মহিলা সমাচার, জুন ১৯৮৫।

২৭. রিজিয়া খাতুন, "মহিলা ক্ষেতমজুরদের জীবন সংগ্রাম", মহিলা সমাচার, জুন ১৯৮৫, পৃঃ ১৯।

২৮. মহিলা সমাচার, জুন ১৯৮৫, পৃঃ ৭।

Dhaka University Institutional Repository

২৯. মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তরের গবেষণা পরিচালক বেগম মেহেরুন্নেসা চৌধুরীর সংগে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উপরিউক্ত তথ্যগুলো পাওয়া গেছে।

৩০. সংবাদ, ১৭ই মার্চ, ১৯৭১।

৩১. বেগম, ২২শে অক্টোবর, ১৯৭২।

৩২. উল্লেখ্য মহিলা পরিষদ একাকী ৩০ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে।

৩৩. সাফ (SAF) গেমস অর্থাৎ দক্ষিণ এশীয় ফেডারেশন গেমস দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের মধ্যে বিভিন্ন খেলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের একটি সংস্থা। এটি ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার (সার্ক — SAARC) ফলশ্রুতিতেই গঠিত হয়েছে। ১৯৮৭ সালে তৃতীয় সাফ গেমস ভারতে অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার ঃ মূল্যায়ন

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের গবেষণামূলক বিশ্লেষণ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে ১৯৬৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল নারী সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বস্তরের নারী সমাজকে সংগঠিত করার যে ঘোষণা জানিয়ে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেসব অধিকার ও দাবী সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম না হলেও এই পরিষদ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করেছে। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান পুরুষের তুলনায় অবনমিত। নারীসমাজ পুরুষ-সমাজের কর্তৃত্বের অধীন, নারীরা এদেশে যুগ যুগ ধরে পরিবারের লালন কর্ত্রী এবং শিশুর জন্মদাত্রী হিসেবে পরিগণিত হয়ে এসেছে। আইনগতভাবে মহিলাসমাজের প্রতি বৈষম্য বিরাজমান। বাস্তবে মহিলারা পুরুষের সাথে সম অধিকার ভোগ করে না। অর্থনৈতিকভাবে বিভিন্ন পদচারনায় মহিলাদের গতিশীলতা খুবই সীমিত। শিক্ষাক্ষেত্রেও বাংলাদেশের নারীসমাজ পুরুষের তুলনায় অনেক পশ্চাদপদ অবস্থানে বিরাজ করছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত এবং নির্ভরশীল। এ সকল অবস্থা থেকে নারী সমাজকে মুক্ত করার জন্য ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সাংগঠনিক ও আন্দোলনমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জন্ম হলেও সাংগঠনিকভাবে মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে প্রধানতঃ সমাজের উচ্চ মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলাগণই রয়েছে এবং তাদের অধিকাংশের

Dhaka University Institutional Repository

বয়স ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। শিক্ষাগত যোগ্যতার মানদন্ডে অধিকাংশ নেত্রীই স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর অধিকারী। ঐসকল নেত্রীর স্বামী এবং পিতাও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ও উচ্চমানের পেশায় নিযুক্ত। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মহিলা পরিষদের নেত্রীগণ নিঃসন্দেহে স্বচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত পরিবারভুক্ত। এককথায় মহিলা এলিটগণই সংগঠনটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এই সংগঠনে প্রকৃত অর্থে সমাজের সর্বস্তরের মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নেই বললেই চলে। কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে নয় সম্ভবত, আঞ্চলিক কমিটিগুলোর নেতৃত্বও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আপেক্ষিকরূপ নিয়ে বিরাজ করছে।

গবেষণার তৃতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে বাংলাদেশে মহিলা পরিষদ বিভিন্ন কর্মসূচী ও দাবী নিয়ে জন্ম নিয়েছিল। নিঃসন্দেহে নারী সমাজের সার্বিক বিকাশ ও প্রগতির জন্য মহিলা পরিষদ বিভিন্নভাবে সরকারের প্রতি দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে চাপ সৃষ্টি করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে প্রবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আইন। বিবাহ সংক্রান্ত পারিবারিক আইন, যৌতুক আইন, পারিবারিক আদালত গঠন, নারী নির্যাতন বন্ধ সংক্রান্ত আইন, চাকুরীর ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত কোটা বৃদ্ধি, রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি প্রভৃতির প্রবর্তন বাংলাদেশের বিভিন্ন নারী সংগঠনের বিশেষ করে মহিলা পরিষদের সংগ্রামেরই ফল। সংস্থার সার্থকতা বিশ্লেষণ করলে, বলা যায় যে, মহিলা পরিষদের সংগ্রামের ফলে নারী সমাজের চেতনাস্তরের উন্নতি হয়েছে। আন্দোলন ও কর্মের মাধ্যমে দক্ষ ও সক্রিয় কর্মীর সংখ্যা সংগঠনে দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঐ সমস্ত কর্মী নারী প্রগতির আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া বিভিন্ন মহিলা সংগঠনে, দেশের বুদ্ধিজীবি সমাজে, সরকারী মন্ত্রনালয়ে — সর্বত্রই পূর্বের

Dhaka University Institutional Repository

তুলনায় মহিলাদের সম্মান ও মর্যাদা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা মহিলা পরিষদের নিরলস ও অবিচ্ছিন্ন কর্মধারার ফল। অনেক সময় লক্ষ্য করা গেছে অনেক সাধারণ মহিলা নারী সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মহিলা পরিষদকে আন্দোলন করতে অনুরোধ জানিয়ে থাকে।[১] বাংলাদেশে সার্বিক, রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত দিক থেকে লক্ষ্য করা যায় যে সংগঠনসমূহ সচল ও সজীব থাকেনা— স্থবিরতা, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, ইত্যাদি কারণে সংগঠনগুলো বিপর্য্যস্ত হয়। পরিষদের সার্থকতার এটাও একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক যে সংগঠনটি এ সমস্ত ত্রুটির উর্দ্ধে থেকে নিজস্ব কার্যধারা অব্যাহত রেখেছে, কাঠামো সচল রেখেছে এবং সাংগঠনিক অখন্ডতা ও গতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বাংলাদেশের নারী সমাজের বিভিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে যথেষ্ঠ সফলতা লাভ করলেও সংগঠনটির বেশ কিছু দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমতঃ বাংলাদেশের নারী সমাজের সর্বস্তরে মহিলা পরিষদের পরিচিতি ও বিস্তৃতি নেই। কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে নয়, মহিলা পরিষদের এক উর্ধতন কর্মকর্তার মতে সাধারণ সদস্যাদের মধ্যেও প্রায় ৯০% মধ্যবিত্ত ঘরের নারী, উচ্চ মধ্যবিত্ত ৫% এবং নিম্নমধ্যবিত্ত ২%। এদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯৫% শহরের মহিলা।[২] যদিও বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী গ্রামে বাস করে এবং তারাই নিরক্ষর ও নিপীড়িত নারী গোষ্ঠির এক বিরাট অংশ। গ্রামেই নারী সমাজের সমস্যা ও সংকট বেশী অথচ গ্রামীন এলাকায় মহিলা পরিষদের সংগঠন অত্যন্ত সীমিত। দেশের অনেক অঞ্চলে মহিলা পরিষদের কোন শাখা নেই বললেই চলে। দ্বিতীয়তঃ এই সংগঠনে তরুনী নেতৃত্বের ও সদস্যার সংখ্যা খুব কম। প্রকৃতপক্ষে তাদের সংগে পরিষদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেনি বলে মনে হয় অথচ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নে এসব মহিলাদের সংগঠিত হওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তব সম্ভাবনা আছে। তৃতীয়তঃ সংগঠনে যে সকল কর্মী রয়েছেন তাদের অনেকেরই নারী আন্দোলন গড়ার তত্ত্বগত ও বাস্তব দুটোরই অভিজ্ঞতা কম। একটি নারী সংগঠন হিসেবে মহিলা পরিষদের বক্তব্য, কর্মসূচী ও মূলনীতি বাস্তবায়নের জন্য কাজের যে বিশেষ ধারা হওয়া প্রয়োজন সেগুলো সম্পর্কে সম্ভবত সংগঠক ও কর্মীদের পরিস্কার ধারনার যথেষ্ট অভাব আছে। সর্বোপরি মহিলা পরিষদ এখনও এদেশের নারী আন্দোলনের মূলধারায় একমাত্র প্রভুত্বশালী সংগঠনরূপে গড়ে উঠতে পারে নি। এর পিছনে একাধারে যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণ রয়েছে তেমনি আরেক দিকে সংগঠনে সচেতন উদ্যোগী প্রচেষ্টার অভাবও রয়েছে। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পশ্চাদপদতা ও নারী সমাজের নিম্নমানের শিক্ষার হার সচেতন উদ্যোগী নারী প্রচেষ্টায় সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ কাজ করছে। মূলতঃ দেশের চরম অর্থনৈতিক সংকটের দরুন নারীদের ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক সমস্যা রয়েছে। ফলে সর্বস্তরের নারীর পক্ষে এরূপ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে বেশী করে সময় দেয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, সংগঠনের ভিত্তি শক্ত করার জন্য প্রয়োজন অর্থের। মহিলা পরিষদও এই সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। এসকল সমস্যার প্রেক্ষাপটে মহিলা পরিষদ নারী সমাজের অগ্রগতির লক্ষ্যে বিভিন্ন বাঁধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়। মহিলা পরিষদের সাংগঠনিক, অর্থনৈতিক ও গনমুখী হওয়ার দুর্বলতার কারনেই সংগঠনটি দেশের নারী সমাজের সকল দাবী বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হচ্ছে না।

উপসংহারে, মহিলা পরিষদের কিছু ব্যর্থতা ও সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এটা বলা বাহুল্য যে এই সংগঠন বাংলাদেশের নারী সমাজকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং বর্তমানে নারী সমাজের অগ্রগতির জন্য বিবিধ কর্মসূচী

Dhaka University Institutional Repository

ও দাবি নিয়ে আন্দোলন করছে। এরই ফলে নারী অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন প্রবর্তিত হয়েছে ও বিভিন্ন নতুন নতুন সংস্থাতে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে (যেমন, পুলিশে, আনসার বাহিনীতে, ব্যাংকে প্রভৃতি)। একটি সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী হিসেবে দেশের সর্বস্তরে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ স্বীকৃত। সরকারও এই সংগঠনের বিভিন্ন দাবীর প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গোষ্ঠী তত্ত্বের আলোকে মহিলা পরিষদের বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে নারী সংগঠনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলেই সরকারী সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয়েছে। গোষ্ঠী তত্ত্বের প্রয়োগযোগ্যতা এখানে যথার্থভাবে ফুটে উঠে। একটি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে সমগ্র দেশব্যাপী ও নারী সমাজের মধ্যে মহিলা পরিষদের পরিচয় আংশিকভাবে হলেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের অবহেলিত নারী সমাজ যাতে মহিলা পরিষদের কাছে থেকে ভবিষ্যতে আরও কিছু পেতে পারে সেজন্য সংগঠনকে নতুন ধারায় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ব্যাপক আন্দোলন ও কর্মসূচী ছাড়া বাংলাদেশের নারীসমাজের প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১. তথ্য পরিষদ অফিসে সাক্ষাৎকার থেকে সংগৃহীত।

২. সাধারণ সম্পাদিকার সংগে সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

প্রশ্নমালা

১. (ক) নাম

(খ) পদমর্যাদা

(গ) বয়স -

২. (ক) আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা —

(খ) আপনার স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতা —

(গ) আপনার পিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা —

৩. (ক) আপনার পেশা —

(খ) আপনার স্বামীর পেশা —

(গ) আপনার পিতার পেশা —

৪. (ক) আপনার মাসিক আয় কত ?

(খ) আপনার স্বামীর মাসিক আয় কত ?

(গ) আপনার পিতার মাসিক আয় কত ?

৫. আপনি নিজেকে কোন শ্রেণীর লোক মনে করেন : ধনী/উচ্চ মধ্যবিত্ত/মধ্যবিত্ত/নিম্নমধ্যবিত্ত/গরীব।

Dhaka University Institutional Repository

৬. (ক) আপনি কি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যা ?

(খ) যদি না তবে কি আপনি কোনদলের সমর্থক ?

(গ) আপনার মতে মহিলা পরিষদ কি কোন রাজনৈতিক দলের অংগ সংগঠক ?

৭. (ক) আপনার মতে মহিলা পরিষদ কি নারী উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে ?

(খ) উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো উল্লেখ করুন —

(উপরিউক্ত প্রশ্নগুলো বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির (১৯৮৬-৮৭) সদস্যাদের করা হয়েছিল) ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী
(BIBLIOGRAPHY)

গ্রন্থাবলীঃ

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মশালা, ১৯৮৭, ঢাকাঃ ১৯৮৭।

---------- নারী মুক্তি আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকাঃ ১৯৮৩।

---------- বেগম রোকেয়া স্মরণে, ঢাকাঃ ১৯৮২।

---------- সত্তর দশকের নারী আন্দোলন ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকাঃ ১৯৮০।

Bebel, A. Woman Under Socialism. New York: Schocken Books, 1971.

_____ Women in the Past, Present and Future, London: William Reeves 1983.

Beard, M.R. Woman as Force in History. New York: Macmillian, 1947.

Bernard, J. Woman and the Public Interest. Chicago: Aldine, 1971.

Boserup, Ester. Women's role in Economic Development, London: George Allen and Unwin Ltd. 1971.

Dhaka University Institutional Repository

Bretenbach, Joseph. Women's of Asia. New York: John Jay Co., 1968.

Borthwick, The Changing Role of Women in Bengal. Princeton, N.J: Princetion University Press, 1984.

Chowdhury Rafiqul Huda and Ahmed Nilufar R. Female Status in Bangladesh. Dhaka: Bangladesh Institute of Development Studies, 1980.

Chowdhury, Anwarullah, A Bangladesh Village: A Study of Social Stratification. Dhaka: Centre for Social Studies, 1978.

Crepaz, Adele. The Emancipation of Women and Its Problem Consecquences. London: Swan son nenschein, 1981.

Dumount, Rene, Problems and Prospects for Rural Development in Bangladesh. Dhaka: The Ford Foundation, Nov., 1973.

Freeman, Jo. Women: A Feminist Perspective. New York: Mayfield Publishing, 1975.

Germain, Adrienne. Women Roles in Bangladeshi Development and Program Assessment. Dhaka: Ford Foundation, 1976.

Ghosh, S.K. Women in a Changing Society. Delhi: Ashis Publishing, 1984.

Hossain, Manwar; Sharif, Raihan; Huq, Jahan Ara. Role of Women in a Socio-Economic Development in Bangladesh. Dhaka: Bangladesh Economic Association, 1977.

হক, জাহান আরা. স্বনির্ভর মহিলা কর্মসূচী মূল্যায়ন। ঢাকা: স্বনির্ভর বাংলাদেশ ১৯৮২।

Dhaka University Institutional Repository

Islam, Shamima. "Women's Education and Development in Bangladesh" in Role of Women in Socio-Economic Development of Bangladesh. Dhaka: Bangladesh Economic Association, 1977.

Jahan, Rounaq. Women in Politics: A Case Study of Bangladesh. Chicago: University of Chicago,

Joyce, T.A. Women of all Nations. Delhi: Gain Publishing, 1985.

Kabir, Khusi and Others. Rural Women in Bangladesh: Exploring Some Myth. Dhaka: Ford Foundation, 1976.

Kunan, G(ed.). Women in the Family and the Economy. London: Greed Word, 1981.

Latifa Akand and Israt Shamim. Women and Violence in Bangladesh. Dhaka: Women for Women, 1984.

Lemu, B.A. and Hecren. F. Women in Islam. London: Islamic Foundation, 1978.

Lewis, Jane(ed). Women's Welfare, Worker's Rights. London: Groom Helm, 1983.

Manderson, L.(ed). Women's Work and Woman's Role, Economics and Every Day's Life in Indonesia. Canberra: Australian National University, 1983.

_____ Women, Politics and Change, UMNO Malaysia. Kualalampur: Oxford University Press, 1980.

Man Mohan, Kaur. Women in India's Freedom Structure. New Delhi Sterling Pub. 1985.

Matahhari, Martada. The Rights of Woman in Islam. Tehran: WOFIS, 1981.

Dhaka University Institutional Repository

Mehra, R. Woman and Rural Transformation. New Delhi: Concept Pub, 1983.

Miller, Mirium.(ed) Third World Women: UNICEF News Issue 76, July 1973.

Mohammad, Shaukat. Family Laws Ordinance, 1961, Lahore: Pakistan Law Time Publications, 1964.

Mullah, D.F. Principles of Mohammedan Law, Bombay: M.M. Tripathi Pvt. Ltd., 1972.

Noman, Ayesha, Status of Women and Fertility in Bangladesh. Dhaka: UPL, 1983.

Papanek, Hanna and Minault, G.(eds.) Separate Worlds: Studies of Purdan in South Asia. Delhi: Chanakya Publications, 1982.

Qadir, Sayeda Rowshan. Women's Income Earning Activities and Family Welfare in Bangladesh. Dhaka: UNICEF 1981.

Rendel, Margareta, and Ashworth. Women's Power and Political System. London: Groom Helm, 1981.

Sattar, Ellen. Women in Bangladesh: A Village Study. Dhaka: Ford Foundation, 1974.

Sharma, K. Women in Focus: A Community in Search of Equal Roles. Hyderabad: Sangam Books 1984.

Sharma, R. Nationalism, Social Reform and Indian Women. Patna: Janata Prakashan, 1981.

UNESCO. Woman and Education. Paris: UNESCO 1953.

Dhaka University Institutional Repository

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Status of Women and Family Planning. New York: E/C, 61575 Rev. Sales No. E75 IV, 5, 1975.

Urquhart, Margaret, M. Women of Bengal. Delhi: Culture Pub. 1983.

Ward, Helen. Women, Demography and Development. Canberra: The Australian National University, 1981.

Ward, Barbara. Women in New Asia. Paris, UNESCO, 1965.

Zerina, Begum. Women's Career Training Institute Report, 1972-76. Dhaka: New Baily Road.

প্রবন্ধাবলী:

Ahmad, Qazi Khaliquzzaman. "Female Employment in Bangladesh Review of Status and Policy", in UN Decade, Situation of Women in Bangladesh, Dhaka, 1985.

Ahmed, Mohiuddin. "Working Women in Rural Bangladesh. A Case Study", Community Development Library, Dhaka, 1983.

Ahmed, Perveen. "The Role of Women in Cooperative Development in Bangladesh" Paper prepared for the Regional Conference on the Role of Women in Cooperative Development. Kualalumpur: Malaysis, July, 1975.

Alam, Bilquis Ara. "Women's Participation in Local Government in Bangladesh", in Women and Politics in Bangladesh. Dhaka: Centre For Women and Development 1985.

Dhaka University Institutional Repository

Bertocci, Peter. "The Position of Women in Rural Bangladesh", Paper Presented in a Seminar on Socio-Economic Implications of Introducing HYV in Bangladesh held at Bangladesh Academy for Rural Development, Comilla, April 1975.

Bhuiyan, Rabia, "Legal Status of Women in Bangladesh," in Situation of Women in Bangladesh, Dhaka: Ministry of Social Welfare and Women's Affairs, 1985.

চৌধুরী, আনোয়ারুল্লাহ, "প্রাক-বৃটিশ ভারতীয় সমাজঃ বিশ্লেষণ ও পরিবর্তন", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর, ১৯৮১।

Choudhury Najma. "Women in Politics in Bangladesh," in UN Decade: Situation of Women in Bangladesh, Dhaka: Ministry of Social Welfare and Women's Affairs, 1985.

_____. "Women's Participation in Political Process in Bangladesh: Nature and Limitation" in Women and Politics in Bangladesh. Dhaka: Centre for Women and Development, 1985.

Choudhury, Nuimuddin and Afrose, Gul. "Role of Women in Productive Activities in Bangladesh" Paper presented at the seminar on the Role of Women in Socio-Economic Development in Bangladesh in Dhaka, May, 1976, Bangladesh Economic Association.

Faiz, Razia. "Experience of A Women Politician," in Women and Politics in Bangladesh. Dhaka: 1985.

Imam, Akhtar. "Problems of Working Women in Bangladesh" Paper presented at the Seminar organized by Business and Professional Women's Club. Dhaka: 1983.

Dhaka University Institutional Repository

Islam, Mahmuda. "Women's Organizations and Programme for Women", Situation of Women in Bangladesh. Published by UNICEF, Dhaka.

---------- "Female Primary Education in Bangladesh", in Women and Education. Dhaka: Women For Women, 1978.

Jahan, Rounaq. "Women in Bangladesh", in Women For Women, Dhaka: 1975.

Khan, Salma. "Problems of Professional Women in Bangladesh" Paper Presented at a Seminar Organized by Business and Professional Women's Club of Dhaka, October, 1983.

Khatun, Tahziba. "Women's Education and Home Development: A Report on the Pilot Project of Bangladesh Academy for Rural Development, 1970-73". Comilla: BARD.

Mohamad, Moshtequr. "Role of Women in the Socio-Economic Development of the Country" Paper Prepared for the seminar on the Role of Women in Socio-Economic Development in Bangladesh held in Dhaka: May, 1976, Bangladesh Economic Association.

McCarthy, Florence and Feldnen, Shelly. "Purdah Women Discovered New Sources of Capital and Labour in Bangladesh". Development and Change. Vol. 14, 1983.

মোসলেম, ফওজিয়া. নারী জাগরণ ও মুক্তি, ঢাকা: সুবর্ণ মুদ্রায়ণ, ১৯৮৬।

Mukherjee, B.N. "Status of Women as Related to Family Planning", Journal of Population Research, Vol. 2, No.1, 1975.

Dhaka University Institutional Repository

Papanek, Hanna, "Purdah in Pakistan: Seclusion and Modern Occupations for Women." Journal of Marriage and the Family, August, 1971.

Qadir, S.A. "Modernization of Agrarian Society: A Sociological Study of the Operation of the Muslim Family Laws Ordinance and the Conciliation Courts Ordinance in East Pakistan," Rural Sociology Research Report No.1, 1968.

Salahuddin, Khaleda, "Women in Productive Activities" Paper Presented at the Seminar on Role of Women in Socio-Economic Development in Bangladesh, held in May, 1976 Dhaka, Bangladesh Economic Association.

Sattar, Ellen, "Village Women At Work," in Women For Women Dhaka: University Press Ltd. 1975.

Sattar, M.A. "Status and Role of Women in the Organised Sector in Bangladesh." Paper Prepared for Sub-Regional Seminar on Status and Role of Women in the Organized Sector. Dhaka: Bangladesh, December 12-16, 1977.

++++++++++